NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPA

PAPER VII
MODULES 25-28

ELECTIVE PUBLIC
ADMINISTRATION
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয় পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস
উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ জুলাই, 2011

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক জন-প্রশাসন (সপ্তম পত্র), সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. —২৫

রচনা
অধ্যাপিকা মৈত্রেয়ী বর্দ্ধন রায়

সম্পাদনা
অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. —২৬-২৭

রচনা
অধ্যাপিকা সোমা ঘোষ

সম্পাদনা
অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এ. —২৮

রচনা
অধ্যাপিকা পাঞ্চালী সেন

সম্পাদনা
অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) বিকাশ ঘোষ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ই. পি. এ.—৭

জন-প্রশাসনের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
২৫

একক ১ □ ভারতীয় জনকল্যাণ কৃত্যক এবং আধুনিক পরিকাঠামো ১-৮

একক ২ □ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলী ৯-১৬
(খ) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরীক্ষা-পদ্ধতি ১৭-২৫

একক ৩ □ (ক) প্রবেশন ২৬-৩৩
(খ) প্রশিক্ষণ ৩৪-৪৩

একক ৪ □ মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্পর্ক ৪৪-৫২

পর্যায়
২৬

একক ১ □ কেন্দ্রীয় সরকারের সাংগঠনিক কাঠামো ৫৩-৬০

একক ২ □ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ৬১-৬৯

একক ৩ □ ক্যাবিনেট সচিবালয় ৭০-৭৯

একক ৪ □ কেন্দ্রীয় সচিবালয় ৮০-৮৭

একক ৫ □ সঞ্চালক-সচিবালয়ের সঙ্গে সঞ্চালকের সম্পর্ক ৮৮-৯৮

পর্যায়
২৭

একক ১ □ রাজ্য সচিবালয়ের সংগঠন ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগ ৯৯-১১০
একক ২ □ মুখ্য সচিব—রাজ্য প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ ১১১-১২১
একক ৩ □ জেলা প্রশাসন ও জেলাশাসক (কালেক্টর) ১২২-১৩৩
একক ৪ □ মহকুমাশাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ১৩৪-১৪০

পর্যায়
২৮

একক ১ □ ভারতের পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা প্রশাসন ১৪১-১৫২
একক ২ □ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ ১৫৩-১৫৫
একক ৩ □ ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক ১৫৬-১৬১
একক ৪ □ অর্থ কমিশন ১৬২-১৬৯

একক ১ □ ভারতীয় জনকল্যাণ কৃত্যক এবং আধুনিক পরিকাঠামো

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ ভারতীয় জনকল্যাণ কৃত্যক এবং তার আধুনিক পরিকাঠামো

১.২.১ ভারতীয় জনকল্যাণ কৃত্যকের বিভাগসমূহ

১.২.২ সর্বভারতীয় কৃত্যক

১.২.৩ কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী

১.৩ সারাংশ

১.৪ অনুশীলনী

১.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার মূল্য উদ্দেশ্য হ'ল—

- সরকারী কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব যে সকল রাষ্ট্রকৃত্যকগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাদের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা।
- প্রাক্‌স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যকগণের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হওয়া ;
- স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থা ;
- এদের বিভাগসমূহ ;
- কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের ভূমিকা ;
- রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকের ভূমিকা ;
- সর্বভারতীয় কৃত্যকের ভূমিকা ;
- যেহেতু এইসকল কৃত্যকগণের প্রবেশনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের বা রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন নামক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এই কমিশনের কার্যাবলী আলোচনাও এই এককটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

১.১ প্রস্তাবনা

সব জনপ্রশাসনের ছাত্র-ছাত্রী সকলেই এই বিষয়ে অবগত আছেন যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে চলমান রাখার উদ্দেশ্যে এক বিরাট কর্মীবাহিনী গঠন করা হয়েছে। সাধারণত এই কর্মীবাহিনীর সদস্যগণকে আমরা সরকারী কৃত্যক বা কর্মী বলে থাকি। এই বিশাল কর্মীগোষ্ঠির হাতে সরকারী কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব কিভাবে প্রদান করা হয় এবং এই কর্মীগোষ্ঠিকে কিভাবে প্রশাসনিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তারা কি দায়িত্ব পালন করেন এবং কোন সংস্থা এদেরকে পছন্দ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এই সকল বিষয়ে বিশদ আলোচনাই উক্ত একক-এর মূল উদ্দেশ্য।

১.২ ভারতীয় জনকল্যাণ কৃত্যক এবং তার আধুনিক পরিকাঠামো

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শাসনব্যবস্থা কিছুটা সনাতনপন্থী নীতি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। এখানে সরকারী বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালিত হয়। ফলে সমগ্র প্রশাসনিক পরিকাঠামোটিকে সচল রাখার জন্য এক বিশাল কর্মীবাহিনীর আবশ্যিকতা উপলব্ধি করা হয়। ভারতীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামোটি যেহেতু এই সনাতনপন্থী নীতির দ্বারা প্রভাবিত, রাষ্ট্রকৃত্যক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এখানে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয়। স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানে এই রাষ্ট্রকৃত্যক বাহিনীর উপস্থিতি আইনত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩১২(১) নম্বর ধারায় এই রাষ্ট্রকৃত্যক বাহিনীর কার্যাবলী এবং দায়িত্বভার সম্পর্কে কিছু নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ওপর ভিত্তিশীল। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন ভারতীয় সংবিধানে লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধ কিছুটা আলাদা হওয়ায় ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার পরিচালন রীতিগুলিকে ভারতীয়করণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সাংবিধানিক নীতি অনুসারে রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলী দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বিভাগ দুটির মধ্যে (১) প্রতিরক্ষা কৃত্যক অর্থাৎ Defence Service— রাষ্ট্রীয় সীমারেখা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং (২) জনপালন কৃত্যক অর্থাৎ Civil Service— সংবিধানে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় রীতি নীতিগুলি পরিচালনের দায়িত্ব বহন করেছে।

যেহেতু ভারতীয় জনপালন কৃত্যকের কার্যাবলী উক্ত অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, প্রতিরক্ষা কৃত্যকের বিষয়ে কোনরকম আলোচনা এই অধ্যায়ে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

১.২.১ ভারতীয় জনকল্যাণ কৃত্যকের বিভাগসমূহ

যদিও ভারতীয় সংবিধানে ভারতবর্ষকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়নি

ক্ষেত্রবিশেষে এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতিনীতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রকৃত্যকের পরিকাঠামোটিও যুক্তরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত। ফলে ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুটি রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার পরিকাঠামো পাশাপাশিভাবে গড়ে উঠেছে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকগণ বা Central Civil Service এবং রাজ্যস্তরে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পূর্ণ সমর্থন করা হয়নি। ফলে কেন্দ্রাভিগামী মনোভাব সাংবিধানিক রীতিনীতিতে প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুসারে ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এককেন্দ্রীক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে অমান্য করা হয়নি। ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এককেন্দ্রীক ব্যবস্থার প্রভাব বজায় রাখার মনোভাব নিয়ে রাষ্ট্রকৃত্যকের সর্বোচ্চ স্তরে একটি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার All India Service প্রচলন করা হয়েছে। এই জনপালন কৃত্যকগণ প্রশাসনিক পরিকাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন। তাছাড়া কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভাগীয় কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃত্যকগণের হাতে আরোপ করা হয়।

ভারতীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামোটি মূলত প্রশাসনিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ (Administrative Hierarchy) পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। এই ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের (Hierarchy) সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি বিভাগীয় প্রধান হিসাবে প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সকল জনপ্রতিনিধিগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ফলে এই সকল রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কাজেই প্রশাসনিক কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার দায়িত্ব স্থায়ী রাষ্ট্রকৃত্যকগণের হাতে প্রদান করা হয়েছে। প্রশাসনিক পরিকাঠামোটিকে সচল রাখার দায়িত্ব যে সকল রাষ্ট্রকৃত্যকের হাতে অর্পণ করা হয়েছে সেই সকল রাষ্ট্রকৃত্যকের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে বর্ণনা করা হল।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিয়োজিত সকল কর্মীগণই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত। এই রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যগণের দায়িত্বভার কতগুলি স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। এই স্তরবিন্যাসের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন ক-শ্রেণীভুক্ত (Group A) কর্মচারী এবং এই স্তরবিন্যাসের পরবর্তী স্তরগুলিতে রয়েছে খ-শ্রেণী (Group B), গ-শ্রেণী (Group C) এবং ঘ-শ্রেণী (Group D)। এই স্তরবিন্যাসের প্রথম স্তরটিতে রয়েছেন বিভিন্ন বিভাগীয় সচিবগণ। তাছাড়া একই স্তরে রয়েছেন শাখা আধিকারিকগণ (Secretary & Directors)। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent or Section Officer) বা বিভাগীয় অধিকারীক, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক (Asst. Superintendent or Asst. Section Officer)। প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের পদাধীকারীগণকে (Gazetted Officer) পর্যায়ভুক্ত বলা হয়। তবে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের কর্মীগণকে সরকারী পদাধিকারী হিসাবে গণ্য করা হয় না।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক : কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের পরিকাঠামোটিকে নিম্নোক্ত কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হয়— ১) ভারতীয় পররাষ্ট্রকৃত্যক (Indian Foreign Service), ২) ভারতীয় আয়কর কৃত্যক (Indian Income Tax Service), (৩) ভারতীয় হিসাব পরীক্ষা এবং গণনাকৃত্যক (Indian Account Service), ৪) ভারতীয় ডাক কৃত্যক (Indian Postal Service) ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সকল কর্মচারীগণ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দ্বারা নিযুক্ত হন। তবে তাদের নিয়োগপত্র, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

রাজ্য জনপালন কৃত্যক : সংবিধান অনুসারে রাজ্য জনপালন কৃত্যকের অধীনে অনুরূপভাবে রাজ্যকৃত্যকগণ রয়েছেন। এই রাজ্যকৃত্যকদের মধ্যে রয়েছেন ভূমি এবং ভূমি রাজস্ব কৃত্যক, ভেটিনারী কৃত্যক কৃষি কৃত্যক, জন সম্পদ কৃত্যক শিক্ষা কৃত্যক, স্বাস্থ্য কৃত্যক ইত্যাদি। এই সকল কৃত্যকগণ স্ব-স্ব রাজ্যের রাজ্যপালের দ্বারা নিযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত হন।

১.২.২ সর্বভারতীয় কৃত্যক

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় সংবিধানে এককেন্দ্রীক নীতির প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এক ধরনের সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই স্তরীয় রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে সর্বভারতীয় কৃত্যক নাম দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব এই সকল রাষ্ট্রকৃত্যকগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আম্বেদকরের মতানুসারে (Dr. B. B. Ambedkar) "The constitution provides that without depriving the state of their right to form their own civil services, there shall be an All Indian Service recruited on all India basis." অর্থাৎ রাজ্য সরকারকে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে নিযুক্ত করার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করেও ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রকৃত্যকের সর্বোচ্চ স্তরে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকগণের উপস্থিতি সাংবিধানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সর্বভারতীয় কৃত্যক সম্পর্কে মন্তব্য কল্পে S. R. Maheswari, তাঁর Indian Administration শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের উপস্থিতি মেনে নেওয়া। এই ধরনের সর্বভারতীয় কৃত্যকগণকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে পদ পরিবর্তন করে থাকেন।"

সংবিধানের ৩১২(২) নম্বর ধারা অনুসারে সর্বভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে নিম্নলিখিত তিনটি বিশেষ স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের হাতে আরোপ করা হয়েছে। (All India Service) সর্বভারতীয় প্রতিরক্ষা কৃত্যক বা (Indian Police Service—IPS) আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় বৈদেশিক

কৃত্যক (Indian Foreign Services) অন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে সংবিধানের ৩১২(১) নম্বর ধারায় উল্লেখিত নীতি অনুসারে বলা হয়েছে যে, রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে দেশীয় স্বার্থে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির জন্য এক বা একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তবে পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করে একাধিক সর্বভারতীয় কৃত্যক গঠন করতে পারে। যেমন ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাজ্য অরণ্যকৃত্যকগণকে ১৯৬২ সালে পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় কৃত্যকের অধীনে নিয়ে আসা হয় ফলে সর্বভারতীয় পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই অরণ্যকৃত্যকের সর্বোচ্চ স্তরের (Class-I) কর্মচারী নিয়োজিত হন। একই পদ্ধতিতে এবং একই পার্লামেন্টারী আইনের মাধ্যমে। ভারতীয় প্রকৌশলি কৃত্যক (Indian Engg. Service), ভারতীয় অর্থনৈতিক কৃত্যক (Indian Economic Service), ভারতীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকৃত্যক (Indian Medical and Health), ভারতীয় শিক্ষা কৃত্যক (Indian Educational Service) এবং ভারতীয় কৃষি কৃত্যক (Indian Agricultural Service) ইত্যাদি গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে (১৯৭৬ সালে) সর্বভারতীয় বিচারবিভাগীয় কৃত্যক (Indian Judicial Service) গঠন করা হয়। তবে এই কৃত্যক গঠন করা হয় সাধারণত ১৯৫১ সালে সর্বভারতীয় কৃত্যক আইনের দ্বারা (All India Service Act. 1951)। এই আইনানুসারে ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক এবং ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক-এর নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত। তবে সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারীগণ কেন্দ্রীয় সরকারের কিংবা রাজ্য সরকারের কার্যভার পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তর্ভুক্ত, আমলাতান্ত্রিক সচিব অথবা প্রধান সচিব অবশ্যই সর্বভারতীয় কৃত্যকের নিয়োজিত সদস্য।

সর্বভারতীয় কৃত্যক ঃ ব্রিটিশ আমলেও সর্বভারতীয় কৃত্যকগণ বিভাগীয় পদাধিকারী দায়িত্ব পালন করতেন। তখন এই কৃত্যকগণকে "Secretary of State Service" অর্থাৎ "রাজ্যকৃত্যকের সচিবসমূহ" নাম দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী স্বাধীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাগণ এই কৃত্যকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সভার সদস্যগণের উদ্যোগে এই সর্বভারতীয় কৃত্যককে অব্যাহত রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের চাকুরীতে নিয়োগ চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রণয়নের দায়িত্ব ও ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত আছে। ১৯৫১ সালে প্রণীত পার্লামেন্টারী আইনের (All India Service Act Law 1951) মাধ্যমে। এই সকল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকগণের নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়, এবং উক্ত আইনকে সর্বভারতীয় কৃত্যক আইন নামে অভিহিত করা হয়।

১.২.৩ কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী

সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মীগণ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন (Union Public Service Commission) দ্বারা নিযুক্ত হন। এই সর্বভারতীয় কৃত্যকগণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করেন। তবে রাজ্য সরকার এই সকল কেন্দ্রীয় কর্মীর ওপর কোনরকম বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারেন না বা অপসারণ করার অধিকার ভোগ করেন না। এই সকল কর্মীর ওপর কোন Disciplinary action গ্রহণ করতে হলে অবিলম্বেই তা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের নিকট পেশ করা হয় এবং একমাত্র এই সদস্যগণই বিষয়টির গুরুত্ব নিরূপণ করে সেই কর্মীকে প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

বর্তমান সামাজিক অবস্থায় এবং কারিগরী প্রযুক্তির যুগে এই সকল রাষ্ট্রকৃত্যকগণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে এই যান্ত্রিক যুগে আমলাগণ বা রাষ্ট্রকৃত্যকগণ প্রশাসনিক পরিকাঠামোটিকে অলঙ্কৃত করে আছেন বটে কিন্তু কার্যত সামাজিক উন্নয়নে এদের অবদান সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। বহু রাষ্ট্রনীতিবিদের মতে এই Technical প্রযুক্তিকতার যুগে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের দায়িত্বভার এবং কর্মের ক্ষেত্র অনেক সীমিত হয়ে এসেছে। এই ধরনের রাষ্ট্রকৃত্যকগণের উপস্থিতি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংখ্যা অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপের সৃষ্টি করেছে।

২) সর্বভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত আমলাদের মধ্যে সাধারণত এক ধরনের উন্নাসিকতা পরিলক্ষিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে এরা নিযুক্ত হন। ফলে চাকরিতে যোগদান করার পর তারা মানসিকভাবে নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। ফলে সামাজিক রীতিনীতি নির্ধারণের দায়িত্ব যাদের হাতে আরোপ করা হয়েছে তারাই তাদের অভিপ্রেত ভূমিকা পালনে সক্ষম হন না এবং সরকারী নিয়মাবলী সম্পূর্ণ কার্যকরী করা হয় না।

৩) সর্বভারতীয় কৃত্যক যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় করতে অক্ষম। এই কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত আমলাদের কেন্দ্রীয় নীতির দ্বারা অঙ্গরাজ্যগুলিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ ভারতীয় রাজ্য পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ পদে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সচিবালয়ের সচিবগণ এবং জেলা ও মহকুমা স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে আছেন সর্বভারতীয় কৃত্যকগণ। ফলে এই সকল রাষ্ট্রকৃত্যকগণের ওপর রাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার অর্থাৎ মন্ত্রীগণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ সীমিত থেকে যায় কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারই এই কৃত্যকগণের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং এই কৃত্যকগণের কাজের শর্তাদি কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) এই ধরনের আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামো রাষ্ট্রকৃত্যকগণের সুষ্ঠুভাবে কার্যভার পরিচালনা করার পথে বাধা হয়ে ওঠে, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই নির্দেশ পালন করতে হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রকৃত্যকগণ এই সকল বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। বহুক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অন্যও সরকারী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। ফলে সুষ্ঠুভাবে কল্যাণমূলক সরকারী কার্যভার পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৫) সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারীরা লিখিত এবং সাক্ষাৎকার মূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু চাকুরীক্ষেত্রে তারা নিজস্ব রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত থেকে কাজ করতে অক্ষম। আবার রাজনৈতিক নেতাগণও তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহু বিষয়েই নিরপেক্ষ আমলাগণকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে আমলাগণ দলীয় রীতিনীতির ওপর নির্ভর করে কার্যভার পরিচালনা করতে বাধ্য হন। এর ফলে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৬) প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময়ই রাষ্ট্রকৃত্যকগণ রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক চাপ অনুভব করেন। ক্ষেত্রবিশেষে আমলাগণের আনুগত্য আদায়ের জন্যও তাদেরকে সুবিধাজনক পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং প্রয়োজনে তাদেরকে রাজনৈতিক পদেও অধিষ্ঠিত করা হয়। আবার প্রয়োজনমত এই কৃত্যকগণেরই সমালোচনা করা হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দেওয়া হয়। এই সকল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার ফলেও অনেক সময় আমলাগণ স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করতে সক্ষম হন না।

৭) আধুনিক প্রশাসনিক পরিকাঠামো আজ কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত (Specialized), ফলে Technical কর্মচারীগণের দ্বারা পরিবৃত্ত। ফলে মাঝে মাঝেই সর্বভারতীয় কৃত্যকের পদ বিলোপের দাবী করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভা ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ধরনেরই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাছাড়াও সারকারিয়া কমিশনের নিকট, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকারও এই কৃত্যকের বিলোপ সাধনের ব্যাপারে সুপারিশ করেন। ইদানীং কালেও মাঝে মাঝে সরকারী কৃত্যক সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে। অনেকেই মনে করেন যে, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে রাষ্ট্রকৃত্যকগণ প্রায় দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছেন। কাজেই এই সকল কৃত্যক পদগুলি বিলোপ করে ভারতীয় সরকার তার অর্থ তহবিলে সঞ্চিত অর্থের হার বৃদ্ধি করতে পারেন এবং সরকারী ব্যয়ভার কমিয়ে আনতে পারেন।

১.৩ সারাংশ

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে প্রথম সরকারী কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব সরকারী কৃত্যকগণের হাতে প্রদান করা হয়েছিল, কাজেই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পরিচালনের পদ্ধতি এবং তার আবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করে ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা সমীচীন মনে করিনি। তাই ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করার আগে, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম এবং কর্মীগণের বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করার পর আমি এই অধ্যায়ে ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন এবং কার্যাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এই এককে আমার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রকৃত্যকের ইতিহাস ক্রমবর্ধমান সরকারী কার্যাবলী পরিচালনায় এদের অবদান এবং সরকারী দায়িত্ব প্রদানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করাই উক্ত এককের মূল উদ্দেশ্য।

১.৪ অনুশীলনী

(i) ভারতীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামো গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করুন।

(ii) প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পরিচালনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা নির্দেশ করুন।

(iii) প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সর্বভারতীয় কৃত্যকের অবস্থান এবং সংকট সম্পর্কে টীকা লিখুন।

(iv) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন এবং কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

১.৫ গ্রন্থপঞ্জী

1. Avasthi & Maheswari – *Public Administration.*
2. Sriram Maheswari – *Indian Administration.*

একক ২(ক) □ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলী

গঠন (ক)

২.০ (ক) উদ্দেশ্য

২.১ (ক) প্রস্তাবনা

২.২ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলী

২.২.১ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন

২.২.২ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা

২.২.৩ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কাজ

২.২.৪ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মন্তব্য—

২.৩ (ক) সারাংশ

২.৪ (ক) অনুশীলনী

২.৫ (ক) গ্রন্থপঞ্জী

২.০ (ক) উদ্দেশ্য

এই এককে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠনের ইতিহাস এবং কার্যাবলী আলোচনা করা হল। কাজেই এই একক পাঠ করে আমরা জানতে পারব,

- স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকৃত্যকের ইতিহাস ;
- রাষ্ট্রকৃত্যকের বিবর্তন ;
- রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন ;
- রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ;
- কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কাজ ;
- কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মন্তব্য।

২.১ (ক) প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের নিয়োগসূচক কার্যাবলী আলোচনা করলাম। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল নিয়োগকারী সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করা। উপদেশ প্রদানকারী এই সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের স্থান এবং অসুবিধা সম্পর্কে আপনাদেরকে অবগত করাই এই এককের মল উদ্দেশ্য।

২.২ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলী

আধুনিক জনপ্রশাসনের মূল লক্ষ্য হল জনগণের সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা করা, কার্যাবলীর ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা, জনসাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং তাদের সঙ্গে প্রকৃত যোগসূত্র রক্ষা করা, ইত্যাদি। এই সকল দায়িত্ব সাধারণত একজন রাষ্ট্রকৃত্যকের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কাজেই প্রক্রিয়াশীল সরকারী প্রশাসনে কাজ পরিচালনকারীর দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতীয় সামাজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার দায়িত্ব যে কর্মীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সে সকল কর্মী অবশ্যই সমাজে সর্বাপেক্ষা সচেতন, মেধাবী এবং দায়িত্বশীল নাগরিকের মধ্যে অন্যতম এই সকল বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই সরকারী কর্মচারীগণকে বাছাই করার উদ্দেশ্যে এক জটিল নিয়োগ পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে।

এই কর্মচারীগণের নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বও একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থাটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন বা Union Public Service Commission নামে খ্যাত। এই কমিশনের হাতে নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রকৃত্যকদের নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বটে তবে সাথে সাথে অনমনীয় পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। এই রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের উদ্ভব ঘটে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভারতীয় করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এই বছরই একে একে ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক, ভারতীয় পুলিশকৃত্যক, ভারতীয় অরণ্যকৃত্যক এবং ভারতীয় কৃষিকৃত্যক গঠন করা হয়। এই সকল কৃত্যকগণের নিয়োগ ব্রিটিশ কৃত্যকগণের অনুপাতে স্থির করা হত। তবে সেই সময় রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নীতি অবলম্বন করা হয়নি। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এবং রাষ্ট্রকৃত্যকগণের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। ১৯১৯ সালে ৫ই মার্চ Despatch on Indian Constitutional Reform অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তন

কল্পে এক নথিপত্র পাশ করা হয়, এই নথিপত্রেই প্রথম রাষ্ট্রকৃত্যক গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। তবে এই ব্যবস্থা আইনে প্রবর্তিত হয়নি। ১৯২৪ সালে Viscount Lee of Franham-এর সভাপতিত্বে ভারতে উচ্চপদস্থ জনপালন কৃত্যকের ওপর রয়াল কমিশন গঠন করা হয়। এই রয়াল কমিশনই পরবর্তীকালে Lee Commission নামে পরিচিত। এই Lee Commission-এর দ্বারা নির্দেশিত বার্তাতেই প্রথম স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এই কমিশনের নাম ছিল "যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগ কমিশন" স্বাধীন ভারতের সংবিধানে তা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন নামে খ্যাত হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৩১৫ নম্বর ধারায়, কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনে একটি রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের কৃত্যকগণের নিয়োগের উদ্দেশ্যেও আলাদাভাবে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের হাতে যুগ্মভাবে একাধিক রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কখনও আবার কোন রাজ্যের রাজ্যপালের সুপারিশে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে রাজ্য সরকারের কর্মী নিয়োগেও হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করা হয়। অবশ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২.২.১ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন

সংবিধানের ৩১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন বা রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন একজন সভাপতি এবং কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিশনের সদস্যদের সংখ্যা কত হওয়া উচিত সেই বিষয়ে সংবিধানে নির্দেশ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য সংখ্যা পার্লামেন্টের পাশ হয়ে আসা আইনের দ্বারা এবং রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারে ঠিক করা হয়।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি নিয়োগ অন্যান্য সদস্যগণের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে আরোপ করা হয়েছে। তবে রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ এবং সভাপতি সহ সদস্যগণের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত করা হয়। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণের চাকরির শর্তাবলী তার নিয়োগের পর পরিবর্তন করে সদস্যদের কাজের পক্ষে কোনরূপ অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করা যায়না বা করা যেতে পারেনা। সংবিধানের ৩৩৬ নম্বর ধারা অনুসারে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য ভারত সরকারের বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ চাকুরীতে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া দরকার, তাছাড়া বাকী সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত করা হয়। সংবিধানের এরূপ বিধি ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনে উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আগমন ঘটানো কমিশনের সভাপতি এবং সদস্যগণ ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয়

রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ ৬৫ বৎসর এবং যুগ্ম ও রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত চাকুরিতে বহাল থাকেন। তবে উপযুক্ত সদস্যকে সভাপতির পদে উন্নীত করে তার অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা ৬৫ বৎসর করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির ন্যায় অবসরগ্রহণের পর অন্য কোন কাজে যোগদান করতে পারেন না।

২.২.২ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা

রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সংবিধানে কয়েকটি নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১) সংবিধানের ৩১৭ নম্বর ধারা অনুসারে কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যগণকে প্রশাসন বিভাগের খেয়াল খুশী বা সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে অপসারণ করা যায় না। কেবলমাত্র কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগের ভিত্তিতে এবং সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে, রাষ্ট্রপতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্যপাল কমিশনের সদস্যগণকে অপসারণ করতে পারেন বা অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

২) ৩১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি এবং সদস্যদের আরও একটি বিষয়ে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ থাকতে সাহায্য করা হয়েছে। এই সংস্থায় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ উক্ত পদে নিযুক্ত হওয়ার পর চাকরির শর্তাবলী তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে পরিবর্তন করা যাবে না।

৩) সংবিধানের ৩২২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্য পরিচালনার জন্য বা অন্যান্য খরচ বাবদ যার ব্যয় সঞ্চিত তহবিল থেকে নির্বাহ করা হবে। রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যদের বেতন বা ভাতা নিয়ে পার্লামেন্ট-এ কোন ভোটাভুটি হতে পারবে না।

৪) সংবিধানের ৩১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে আবার বলা হয়েছে যে, অসদাচরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে অপসারণ করার ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিই রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণকে অপসারণ করতে পারেন। রাজ্যপাল রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের কোন গর্হিত কাজের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারেন, তবে বরখাস্ত করার আগে বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা হয় এবং প্রয়োজনে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করে তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতি সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যকে অপসারণ করেন।

৫) ৩১৭(২) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আরও কিছু কারণে রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য বা সভাপতিকে অপসারণ করতে পারেন। যে সকল কারণে সদস্য বা সভাপতিকে অপসারণ করা হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

ক) যদি কোন সদস্য দেউলিয়া বলে ঘোষিত হন অথবা রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য পদে নিযুক্ত থেকেও অন্য কোন লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন, অথবা শারীরিক দুর্বলতার দরুণ সদস্য পদে বহাল থাকতে অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপতি সেই সদস্যকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন।

২.২.৩ (ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কাজ

ভারতীয় সংবিধানের ৩২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের প্রথম কাজ হল — সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যকৃত্যকে উপযুক্ত মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিবান ব্যক্তি নিযুক্ত করার সুপারিশ করা।

খ) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের অনুরোধে যে কোন কৃত্যকের যোগ্যতম ব্যক্তি নিযুক্ত করা বা প্রার্থী মনোনয়নে সাহায্য করা।

গ) কোন রাজ্যের রাজ্যপালের অনুরোধে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কৃত্যক সম্পর্কিত যে কোন কাজ সম্পন্ন করা।

ঘ) রাষ্ট্রপতির পরামর্শক্রমে, রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রকৃত্যক সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা, যেমন —

(১) অসামরিক বা জনপালন কৃত্যক বা অসামরিক পদগুলিতে ভর্তি এবং লোক সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করা।

২) ভারত সরকার ও রাজ্যসমূহের সরকারগুলির অধীনে নিযুক্ত অসামরিক কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কিত বিষয়ে সন্ধান করা।

(৩) ভারত সরকার ও রাজ্যসমূহের সরকারগুলির অধীনে নিযুক্ত অসামরিক কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া।

(৪) ভারত সরকারের বা রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারী আঘাতপ্রাপ্ত হলে, তার দাবীদাওয়া সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে মতামত প্রদান করা।

(৫) ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বা উদ্ভূত ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যয়ভার সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রদান করা হবে কি না সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইত্যাদি।

সাধারণত রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরামর্শ ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারগুলি তাদের কর্মচারীদের নিয়োগের নীতি নির্ধারণ, নিয়োগ পদ্ধতি স্থির করা, বদলি এবং উন্নত পদে বহাল করা সম্পর্কিত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না।

ঙ) এই সকল কাজ ব্যতীত রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের অপর একটি কাজ হল সৃষ্ট এবং বর্ধিত অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব পালন করা। সংবিধানের ৩২১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন এবং রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের কার্যাবলী পার্লামেন্টের ও রাজ্য আইনসভার সৃষ্ট আইন দ্বারা বর্ধিত হতে পারে। পার্লামেন্ট প্রয়োজনীয় আইনের সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের, কর্পোরেশনের ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে। এই একই ব্যবস্থা রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের জন্য কর্মী নিয়োগ করার কাজও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সুপারিশেই হয়ে থাকে।

চ) সর্বশেষে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন বৎসরান্তে তাদের কাজ সংক্রান্ত রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ করেন (৩২৩ নং অনুচ্ছেদ)। আবার রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল উক্ত কার্যাবলীর বিবরণী পার্লামেন্টে বা রাজ্য আইনসভার নিকট আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। তবে এই বিবরণীর সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় যোগ করা হয়। অর্থাৎ কি কারণে রাষ্ট্রকৃত্যকের পরামর্শ অনুসারে কাজ করা সম্ভব হয়নি বা রাষ্ট্রকৃত্যকের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি বিশেষ বিবরণী প্রদান করা রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের কাজ।

২.২.৪ (ক) রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মন্তব্য

ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা অনেকটা পরামর্শদাতা সংস্থার ন্যায়। ভারতীয় সংবিধানেও এমন কোন ব্যবস্থা করা হয়নি যার ফলে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের নির্দেশ মেনে কোন সংস্থা কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতীয় সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি তৈরি করার আগে থেকেই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রাষ্ট্রকৃত্যক সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। যে সকল বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরামর্শদাতার ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তারা এ বিষয়ে Simon Commission-এর উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেন এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবেই বর্ণনা করেন। কারণ Simon Commission মন্তব্য করেন যে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, গুণাগুণ বিচার করবেন কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হবে। তবে যে সকল বিশেষজ্ঞগণ রাষ্ট্রকৃত্যকের আদেশমূলক ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে আদেশমূলক কর্তৃপক্ষ হিসেবে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলেই গণ্য করেন। তারা রাষ্ট্রকৃত্যকের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Royal Commission-এর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেন। এই Royal Commission মন্তব্য করে যে, "The Public Service Commission should be the final authority, so far as recruitment in India is concerned"।

অর্থাৎ রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকগণের নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতা উপভোগ করবে।

তবে ভারতীয় সংবিধানের ৩২০ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে একটি পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়। ভারতীয় সংবিধানে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের মূল কারণ হল যে, যেহেতু ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে সেইহেতু সংবিধান সরকারী কাজের চূড়ান্ত দায়িত্ব মন্ত্রী পরিষদের ওপর অর্পণ করেছে। কাজেই সরকারী কর্মচারী নিয়োগে মন্ত্রী পরিষদের মতামতকেই চূড়ান্ত মতামত বলে মনে করা হয়। তবে পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গুরুত্বও কিছু কম নয়। মন্ত্রীপরিষদ সর্বদাই সচেতন যে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষের বা কমিশনের পরামর্শ তার কার্য পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা সরকার বা মন্ত্রীপরিষদের হাতে ন্যস্ত রাখা সমীচীন ও বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করা হয়।

(২) আবার সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন বৎসরান্তে তার রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের কাছে দাখিল করে এবং রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের দায়িত্ব হল এই রিপোর্ট আইনসভায় পেশ করা এবং পাশ করিয়ে নিয়ে আসা। শুধু তাই নয় কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হয়েছে যে বিষয়ে কারণ দর্শিয়ে আইনসভায় তার একটি রিপোর্ট পেশ করাও রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের কাজ। এই ব্যবস্থাটি যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কমিশনের গুরুত্ব বৃদ্ধির সহায়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় একটি প্রধান ত্রুটি হল যে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করার বিষয়ে কবে রিপোর্ট পেশ করতে হবে সে সম্পর্কে কোন সময়সীমা নির্দেশ করা হয়নি। ফলে রিপোর্ট পেশে বিলম্ব হলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে গর্হিত ভাবে কমিশনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলেও আইনসভায় তা পেশ করা হয় না এবং আইনসভার বিরোধী দলের সদস্যদের সমালোচনা করার কোন সুযোগ থাকে না।

তবে একথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ সংস্থা বলেই গণ্য করা হয়েছে কিন্তু এর স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত মান্য করার উদ্দেশ্যে কোন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে শাসক এবং বিরোধীদল উভয়েই প্রয়োজনে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরামর্শ বা সুপারিশ অমান্য করে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা যেমন রাষ্ট্রকৃত্যকগণের নিয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, তেমনি এর সুপারিশ এবং পরামর্শ মান্য করাও সরকারের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

যদি কোন বিশেষ কারণে সরকার কমিশনের পরামর্শ মেনে নিতে অক্ষম হন, তবে সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব হল, এই পরামর্শ মেনে না নেওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করা। আবার কোন ক্ষেত্রে কমিশনও যদি ভুল পরামর্শ প্রদান করে তবে উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রচেষ্টা রাখাই বাঞ্ছনীয়। কাজেই সরকার পক্ষ এবং কমিশনের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং কমিশনের পরামর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যদি উভয়ের মধ্যে একটি সুস্থ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গঠন করা হয় তবেই রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ন্যায় কোন সংস্থার উপস্থিতি সার্থক হয়।

২.৩ (ক) সারাংশ

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন করায় প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশ ভারতবর্ষেই প্রথম উপলব্ধি করা হয়, কাজেই ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ থেকেই এই সংস্থাটিকে উপযুক্ত নিয়োগকারী সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং বিস্তারিতভাবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করা হয়। যেহেতু এই রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন একটি নিরপেক্ষ উপদেশ প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে পরিচিত বহুক্ষেত্রেই ওই রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের মতামত সামান্য করেই বিভাগীয় প্রধানের নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। এই সকল বিষয় সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ করাই এই এককের মূল উদ্দেশ্য।

২.৪ (ক) অনুশীলনী

(১) রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(২) রাষ্ট্রকৃত্যকগণের প্রবেশনের ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

(৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকৃত্যকের ভূমিকা নির্দেশ করুন।

২.৫(ক) গ্রন্থপঞ্জী

1. Sriram Maheswari – *Indian Administration.*

একক ২(খ) □ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরীক্ষা-পদ্ধতি

গঠন (খ)

২.০ (খ) উদ্দেশ্য

২.১ (খ) প্রস্তাবনা

২.২ (খ) প্রাক্ ১৯৭৯ সালের রাষ্ট্রকৃত্যকগণের পরীক্ষা-পদ্ধতি

২.২.১ (খ) ১৯৭৯ সাল থেকে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের প্রবেশন বা নিয়োজনের পরিবর্তন

২.৩ (খ) সারাংশ

২.৪ (খ) অনুশীলনী

২.৫ (খ) গ্রন্থপঞ্জী

২.০ (খ) উদ্দেশ্য

এই এককের মূল উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রকৃত্যকগণের নিয়োজনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা। যে পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা-পদ্ধতির বিভিন্ন স্তরগুলিকে আলোচনা করা হ'ল তা এরূপ—

- প্রাক ১৯৭৯ সালের রাষ্ট্রকৃত্যকের পরীক্ষা-পদ্ধতি;
- নিয়োগ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোঠারী কমিটির প্রতিবেদন;
- লিখিত পরীক্ষা-পদ্ধতি;
- সাক্ষাৎকার;
- ১৯৭৯ সাল থেকে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের প্রবেশন বা নিয়োজনের পদ্ধতি।

২.১ (খ) প্রস্তাবনা

আমরা সকলেই জানি যে, প্রশাসনিক কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার প্রয়াসে যে সকল রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে নিয়োগ করা হয় তাদের মেধা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং আকস্মিকভাবে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার ক্ষমতা সাধারণ জনগণ থেকে একটু স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। এই কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে একটি জটিল পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। যে

জটিল পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এই সকল কৃত্যকগণকে নিয়োগ করা হয় সেই পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করাই এই এককের মূল উদ্দেশ্য।

২.২ (খ) প্রাক্ ১৯৭৯ সালের রাষ্ট্রকৃত্যকগণের পরীক্ষা-পদ্ধতি

ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যকগণের নিয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতা বা মেধার ভিত্তিতে পরিচালিত, কাজেই এই ব্যবস্থা রাজনৈতিক পরিত্রেষণের নীতিতে বিশ্বাসী নয় (Spoils System)। ভারতীয় ব্যবস্থায় স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং আধা বিচারবিভাগীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের নিয়োজন করা হয়। ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রকৃত্যকের উচ্চপদে নিয়োজনের বয়স ছিল ২১ থেকে ২৪ পর্যন্ত। রাষ্ট্রকৃত্যকে উচ্চপদে নিয়োজিত ব্যক্তির ভারতীয় নাগরিক হওয়া যেমন আবশ্যিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রী একান্ত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত। ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বা কলা বিভাগের স্নাতকের যোগ্যতা কৃত্যক নিয়োগের অন্যতম অঙ্গ বলে গণ্য করা হোত। এই শিক্ষাগত মান স্থিরীকরণের পিছনে কতগুলি কারণও ছিল। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত এবং সরকারী পদপ্রার্থীর সংখ্যাও প্রয়োজনাতিরিক্ত। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেই জটিল পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের নিয়োজনের আয়োজন করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন চাকুরীতে নিয়োজনের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের। যেমন সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় কৃত্যকগণের নিয়োজনের পদ্ধতি এক, তাছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরী প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করা হয়েছে। তবে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ পদের জন্য একই যোগ্যতার কথা বলা হয়না। যেমন—উপ-হিসাব কৃত্যক (Subordinate Account Service) হিসাব সংস্থার বিভাগীয়-হিসাব রক্ষক (Divisional Accountant in Indian Audit and Accounts Service) প্রভৃতি। সরকারী ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পদগুলিতে ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে স্থির করা হয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্য নিম্নস্তরের আসনগুলির জন্য অর্থাৎ প্রতিবেদন রক্ষক (Record Stores), প্রতিলিপি গ্রহণ যন্ত্র-পরিচালক (Cyclostyle Machine Operation) এবং কর্মীবৃন্দের সংযোগ স্থাপক (Staff Co-ordinator) ইত্যাদি পদের জন্যও মধ্যস্তরীয় বিদ্যালয় পরীক্ষার পাশের সাক্ষ্য প্রমাণই (Certificate) যথেষ্ট বলে ধরে নেওয়া হয়। তাছাড়া ভারতীয় কৃষিকৃত্যক, ভারতীয় কারিগরীকৃত্যক প্রভৃতি পদে নিয়োজনের ন্যূনতম যোগ্যতা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কিংবা কারিগরী প্রশিক্ষণ সংস্থার স্নাতক। ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের নিয়োগ পদ্ধতি বৃটেনের প্রশাসনিক নিয়োগ পদ্ধতির অনুকরণে করা হয়েছে। কাজেই ভারতবর্ষে মেধা এবং পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমেই কৃত্যকগণকে নিয়োগ করা হয়। তবে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদে উন্নতির মাধ্যমে নিম্নস্তর থেকে কর্মীগণকে তুলে নিয়ে আসা হয়।

এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের নিয়োগ এবং কর্মের শর্তাদি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীয় আইনসভার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ভারত সরকারের প্রশাসনিক কৃত্যক এবং পুলিশ কৃত্যকের সকল কর্মচারীর কর্মের শর্তাদি এইভাবেই নির্দেশ করা হয়। রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের অন্তর্গত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত কৃত্যকগণের ব্যক্তিগত জীবনধারা সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়া, ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর করা প্রভৃতি দায়িত্ব পুলিশ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই পুলিশ বিভাগের দ্বারা ছাড়পত্র প্রাপককে সার্থক পরীক্ষার্থীর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়োজিত ব্যক্তির শারীরিক অব্যবস্থার পরীক্ষা নেওয়া হয় (Medical Test)। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে নিয়োজিত ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে খবরাখবর নেওয়া (Police Verification) আবশ্যিক বলে মনে করা হয়।

নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোঠারি কমিটির প্রতিবেদন :

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়— (ক) লিখিত পরীক্ষা, (খ) মেধাশক্তির পরীক্ষা, (গ) সাক্ষাৎকার বা সম্মুখ আলোচনা (Viva-voce)।

লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি : রাষ্ট্রকৃত্যকে পদ-প্রার্থীদের প্রথমেই যে পদ্ধতির সম্মুখীন হতে হয় তা হল লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের বা প্রবেশনের প্রাথমিক স্তর বা প্রথম পর্যায়। বিশ্বের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রকৃত্যকেই এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োজিত করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকৃত্যকের পদপ্রার্থীর চিন্তাশক্তি, মেধা, অনুপাত বোধের ক্ষমতা, কোনো বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা এবং সাধারণ জ্ঞানের পরিমাণ যাচই করা সম্ভব হয়। এই ক্ষেত্রে প্রার্থীকে যে সকল বিষয়ের ওপর লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয়। তা হল এরূপ —

	বিষয়	নম্বর
(১)	রচনা	১৫০
(২)	সাধারণ ইংরেজী	১৫০
(৩)	সাধারণ জ্ঞান	১৫০

প্রবেশনের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল মেধাশক্তির পরীক্ষা। এই পদ্ধতির দ্বারা প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তা এবং পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এই পরীক্ষায় প্রার্থীগণকে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি বেছে নিতে হয়। তবে ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যকের প্রার্থীগণ নির্ধারিত বিষয়গুলি থেকে যে কোন দুটি বিষয় বেছে নিতে পারেন কিন্তু অন্য কোন কৃত্যকের প্রার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কোন প্রার্থীই সংস্কৃত এবং পালি এই দুটি বিষয় বেছে নিতে পারেন না। সর্বভারতীয় প্রশাসন কৃত্যক এবং ভারতীয়

বৈদেশিক কৃত্যকের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ প্রার্থীদের যে কোন দুটি বিষয়কে বাড়তি বা অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে বেছে নিতে হয়।

সাক্ষাৎকার : এই পদ্ধতিটির মূল উদ্দেশ্য হল প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ যাচাই করা। তাছাড়াও, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব বিচার করা সম্ভব হয়। উভয় পরীক্ষা পদ্ধতিই একজন প্রশাসকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে সক্ষম।

(২) ঐচ্ছিক বিষয়গুলি থেকে যে কোন দুটি বিষয় বাছাই করে নিতে হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের সঙ্গে পরিচিত বিষয়গুলি থেকেই বিষয় বেছে নিতে পারে। ভারতীয় পুলিশ কৃত্যকের জন্য মোট নম্বর ৪০০ এবং অন্যান্য কৃত্যকের জন্য বরাদ্দ নম্বর ৬০০।

অতিরিক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রার্থীগণ ১৫টি বিষয় থেকে যে কোন দুইটি বিষয় বেছে নেন। তবে বিষয়গুলি যেন প্রার্থীর পাঠ্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বিষয় সম্পর্কে তিনি উচ্চমানের জ্ঞানের নিদর্শন রাখতে সক্ষম হন।

বাচনিক পরীক্ষা (Viva-voce) : বাচনিক পরীক্ষায় বিভিন্ন কৃত্যকের ক্ষেত্রে নম্বরের হার বিভিন্ন। যেমন—

(ক) ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকের জন্য ৩০০ নম্বর।

(খ) ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যকের জন্য ৪০০ নম্বর।

(গ) অন্যান্য সকল কৃত্যকের জন্য ২০০ নম্বর।

ভারতীয় প্রশাসন কৃত্যক এবং ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যকের জন্য লিখিত পরীক্ষায় মোট নম্বর	১৪৫০
উক্ত কৃত্যকের বাচনিক পরীক্ষায় মোট নম্বর	৩০০
অর্থাৎ মোট নম্বর	১৭৫০
অন্যান্য কৃত্যকের জন্য মোট নম্বর	১০৫০
অন্যান্য কৃত্যকের বাচনিক পরীক্ষার মোট নম্বর	২০০
ভারতীয় পুলিশ কৃত্যকের লিখিত পরীক্ষার নম্বর	৮৫০
ভারতীয় পুলিশ কৃত্যকের বাচনিক পরীক্ষার নম্বর	২০০

আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতীয় কৃত্যকগণের নিয়োজনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি ব্রিটিশ সরকারী রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত। তবে ভারতীয় বাচনিক পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কটু মন্তব্য শোনা যায়। অনেকেই মনে করেন যে, এই ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন। এই ব্যবস্থায়, স্বজন পোষণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়াও মাত্র ২০-৩০ মিনিটের সাক্ষাৎকারে কোন ব্যক্তির সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা অসম্ভব। সমালোচকের মতে কোন মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।

অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, কোন এক প্রার্থী বাচনিক পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়ার দরুন উচ্চতর কৃত্যকে নিয়োজনের সুযোগ পেলেন না। কিন্তু পরবর্তী বাচনিক পরীক্ষায় তিনি অত্যন্ত ভাল নম্বর পেয়ে উচ্চতর কৃত্যকের পদে নিয়োজিত হলেন। তাতে একথা বোঝা গেল যে, বাচনিক পরীক্ষায় সেই প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের হার বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করেছেন যে, অতি অল্প সময়েই তিনি তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা একেবারেই সম্ভব নয়। ব্যক্তি চরিত্র মানবজীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কোন বহিরঙ্গ শিক্ষার ফলে তা অতি সহজে পরিবর্তিত হয় না। কাজেই উক্ত প্রার্থীর নম্বরের হার বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, পরীক্ষক এই বিষয়ে কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। কাজেই একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, বাচনিক পরীক্ষায় কোন প্রার্থীর ক্ষমতা বা দক্ষতা বিচার করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

২.২.১ (খ) ১৯৭৯ সাল থেকে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের প্রবেশন বা নিয়োজনের পরিবর্তন

রাষ্ট্রকৃত্যকের উচ্চতর কৃত্যকগণকে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে। ঐ সময় ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে একটি নিয়োজন এবং নিযুক্তিকরণ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে নিয়োজন সম্পর্কিত বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা হয় এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছু সংস্কারের প্রস্তাব আসে।

এই কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত প্রবেশন সংক্রান্ত নীতিটি এরূপ—

(১) বিষয়ীগত প্রারম্ভিক পরীক্ষা।

(২) **লিখিত এবং মৌখিক :** এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল কোন প্রার্থীকে Lal Bahadur Sastri Academy of Administration Moussourie-তে প্রবেশ করার ছাড়পত্র প্রদান করা। এই স্তরে একজন প্রার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় (Foundation Course)। তবে এই সব স্তরে প্রার্থীকে কোন নির্দিষ্ট চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয় না (allocated) এবং এই স্তরে একজন প্রার্থী কত নম্বর পেয়েছেন তাও তাকে জানানো হয় না।

(৩) এই প্রশিক্ষণের পরে তৃতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দ্বারা একটি পরীক্ষা গ্র করা হয়। এই ভিত্তি গঠন করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল একজন ব্যক্তি প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সক্ষমতা বিচার করা অসম্ভব। এই স্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের সাক্ষাৎকারের দ্বারা মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করা হয়। এই স্তরে সকল প্রার্থীদেরকে প্রাপ্ত নম্বর জানানো হয়।

এই প্রার্থীদের নম্বরের ওপর নির্ভর করেই তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হয়। কোঠারী কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারতীয় প্রশাসনিক সংস্থা (IAS)-এর এবং প্রধান শ্রেণী সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে একটি প্রারম্ভিক পরীক্ষা চালু করেন (Preliminary Screening Examination) এবং প্রশিক্ষণের পরেও পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু (Post Training Test) করা হয়েছে। এই দুটি পরীক্ষার মধ্যবর্তী স্তরে মূল রাষ্ট্রকৃত্যক পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে একটি ৩০০ নম্বরের সাক্ষাৎকার (Interview) পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। কারণ, এই প্রাথমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া পরীক্ষার্থী পরবর্তী মূল লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থী হতে পারেন না। কারণ, এযাবৎ কালে বহুসংখ্যক প্রার্থী মূল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতেন এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পক্ষে এই বিশাল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষাপত্র পর্যালোচনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন অনেকটা নেতিবাচক সংস্থার (rejecting body) ভূমিকা পালন করছেন। যদিও এর প্রধান ভূমিকা ছিল সরকারী আমলাগণের নিযুক্তিকরণ। এখানে একথাও মনে রাখা দরকার যে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক পরীক্ষায় প্রার্থী বাছাই করার উদ্দেশ্যে যে, প্রাথমিক পরীক্ষা হয় তা সংক্ষিপ্ত উত্তরের মাধ্যমে হয়। কারণ, এই প্রাথমিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেবল প্রার্থী বাছাই করা হয় না। পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতাও পরীক্ষা করা সম্ভবপর হয়।

এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বিতীয় স্তরে আবার মূল লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীকে যথাযথ ভাবে উত্তর প্রশিক্ষণ স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে একটি ৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং সর্বমোট নম্বরের ওপর নির্ভর করে বিভাগে এবং নির্ধারিত প্রার্থীর পছন্দের তালিকা অনুসারে এই সকল প্রার্থীকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত করা হয়। কোঠারি কমিশনের মতানুসারে বর্তমানে ভারতীয় প্রশাসনিক সংস্থা ভারতীয় পুলিশ আয়োগ এবং সাধারণ কেন্দ্রীয় আরোপ প্রথম স্তরের পদগুলির জন্য একই ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে বিভিন্ন পদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এবং কোন পদকে নিম্নস্তরের পদ বলে অবহেলা করা হয় না। কোঠারী কমিটি এই মতামতকে একটি (egalitation step) বলে প্রশংসা করা যেতে

পারে। কোঠারী কমিটির মতানুসারে মৌখিক পরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং উক্ত কমিটির মতানুসারে ৭০০ নম্বরের একটি মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একজন প্রার্থীকে মূল স্তরে নিযুক্ত করার পূর্বে তাকে ৭০০ নম্বরের একটি মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হত। বর্তমানে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ৪০০, ৩০০ ও ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই একজন প্রার্থীকে তার প্রাপ্ত নম্বর বিচার করে এবং তার দেয় পছন্দ অনুসারে ভারতীয় বৈদেশিক কৃত্যক, ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক এবং ১লা নম্বর কেন্দ্রীয় কৃত্যকে নির্বাচিত প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়।

তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন দ্বারা গৃহীত ব্যক্তিত্ব পরীক্ষাকে প্রার্থীপদ নির্ধারণের মূল চাবিকাঠি বলে ধরে নেওয়ার মনোভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

কোঠারী কমিটি আরও একটি সিদ্ধান্তে ছিল যে, উচ্চপদস্থ কর্মচারী একজন প্রার্থীকে নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রশাসনিক সংস্থায় প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং উত্তর-প্রশিক্ষণ পর্বে প্রার্থীকে আরেকটি পরীক্ষায় বসতে হবে এবং সম্পূর্ণ পরীক্ষার ভিত্তিতেই প্রার্থীকে নির্ধারিত পদে নিযুক্ত করা যাবে। তবে মূলত এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়নি। একজন প্রার্থী মূল পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তাকে নির্ধারিত পদে নিয়োগ করা হয় এবং নির্ধারিত পদ গ্রহণ করার পর তাকে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (Academy) প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। সাধারণত কোঠারী কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে পরীক্ষা পদ্ধতিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে — (১) লিখিত পরীক্ষা এবং (২) সাক্ষাৎকার। লিখিত পরীক্ষায় একজন প্রার্থীকে আটটি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা দিতে হয়। (১) ভাষা পরীক্ষা। সংবিধানের ৪ নম্বর ধারা অনুসারে একজন প্রার্থী যে কোন প্রাদেশিক ভাষা কিংবা ইংরেজী মূল ভাষার উত্তরপত্র হিসাবে প্রশিক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ এরূপ— (ক) ইংরেজী, (খ) সাধারণ শিক্ষা, প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র (General Studies), (৩) প্রথম ঐচ্ছিক বিষয় (দুইট পত্র)। (৪) দ্বিতীয় ঐচ্ছিক বিষয় (দুইটি পত্র)।

কোঠারী কমিশনের মতানুসারে একজন প্রার্থী ঐচ্ছিক বিষয়ে নিম্নলিখিত তালিকা থেকে যে কোন দুইটি ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিতে পারেন। এই সকল ঐচ্ছিক বিষয়গুলি হল—

(1) Agriculture, (2) Animal Husbandry and Veterinary Sciences, (3) Anthropology, (4) Botany, (5) Chemistry, (6) Civil Engineering, (7) Commerce and Accountancy, (8) Economics, (9) Electrical Engineering, (10) Geography, (11) History, (12) Geology, (13) Law, (14) ভাষা পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে। অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়া, কাশ্মিরী, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধী, তামিল, তেলেগু, উর্দু, আরবিক, ইংরেজী, ফ্রান্স, জার্মানী, ফার্সী (Persian), রাশিয়ান। (15) Management, (16) Mathematics, (17) Mechanical Engineering, (18) Philosophy,

(19) Physics, (20) Political Science and International Relations, (21) Sociology, (22) Psychology, (23) Public Administration, (24) Statistics, (25) Zoology, প্রার্থীগণ ইংরেজী ছাড়াও উপরোক্ত যে কোন ভাষারই প্রশ্নপত্র সমাধান করতে পারেন। তবে মূল এবং প্রাথমিক স্তরে প্রশ্নপত্র হবে ইংরেজী এবং হিন্দীতে।

যে সকল প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তারা ২০০ নম্বরের একটি মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেন।

১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন রাষ্ট্রকৃত্যক পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র। এই কমিটি তার ১৯৪৯ সালের রিপোর্টে রাষ্ট্রকৃত্যকের পরীক্ষার জন্য কোঠারী কমিশনের প্রদত্ত নীতি অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়। তবে কোঠারী কমিশনের দ্বারা প্রচলিত সূচনামূলক পরীক্ষায় (Objective Test) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হলেও এই কমিটি উক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মূল পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে যোগ করার সপক্ষে ছিল না। এই কমিটির মতে একটি ২০০ নম্বরের রচনাভিত্তিক পরীক্ষা হলে এই নম্বর মূল পরীক্ষায় দেয় নম্বরের সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে। এই কমিটির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন হল রাষ্ট্রকৃত্যকের দরজা ডাক্তারী এবং কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রার্থীদের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এই কমিটি তার প্রতিবেদনে ব্যক্তিত্ব বিচারের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার মোট ২৫ নম্বর থেকে বৃদ্ধি করে ৩০০ নম্বরের বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। এই কমিটির Report ১৯৯৩ সাল থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক পরীক্ষার জন্য মেনে নেওয়া হয়েছে।

২.৩ (খ) সারাংশ

ভারতীয় প্রশাসকগণের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতি কি ধরনের হওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে স্বাধীন ভারতের বহু রথী-মহারথীগণই চিন্তিত ছিলেন। বহু আলোচনা, সমালোচনা এবং গবেষণার পর রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যে পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা হল তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ এই এককে করা হয়েছে। সাধারণত প্রার্থী নিয়োগের পদ্ধতিকে দুটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি প্রাক্-১৯৭৯ ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭৯-উত্তর পরীক্ষা ব্যবস্থা। উক্ত এককে এই দুটি স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা হল।

২.৪ (খ) অনুশীলনী

(১) রাষ্ট্রকৃত্যকগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির বিবর্তন সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

(২) এই পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা কি সুষ্ঠু প্রশাসক নিয়োগ করা সম্ভব ? আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

(৩) সাক্ষাৎকার এবং বাচনিক পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

(৪) পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের বক্তব্য আলোচনা করুন।

২.৫ (খ) গ্রন্থপঞ্জী

1. Sriram Maheswari – *Indian Administration.*
2. J. C. Johari – *Indian Govt. of Politics.*

একক ৩ (ক) □ প্রবেশন

গঠন (ক)

৩.০ (ক) উদ্দেশ্য

৩.১ (ক) প্রস্তাবনা

৩.২ (ক) প্রবেশনের প্রেক্ষাপট

- ৩.২.১ (ক) নিয়োগ পদ্ধতি
- ৩.২.২ (ক) নিয়োজনের যোগ্যতাসমূহ
- ৩.২.৩ (ক) যোগ্যতা নির্ধারণের পদ্ধতি
- ৩.২.৪ (ক) নিয়োগ বা প্রবেশনের সমস্যাবলী
- ৩.২.৫ (ক) পদোন্নয়নের গুণাগুণ

৩.৩ (ক) সারাংশ

৩.৪ (ক) অনুশীলনী

৩.৫ (ক) গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ (ক) উদ্দেশ্য

বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রবেশন পদ্ধতি নির্ধারণ করাই উক্ত এককের মূল উদ্দেশ্য।

- প্রবেশনের ইতিহাস ;
- প্রবেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি ;
- প্রবেশনের গুণাগুণ ;
- প্রবেশনের সমস্যা ;
- পদোন্নয়ন ব্যবস্থা।

৩.১ (ক) প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় হল কি উপায়ে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের প্রবেশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

৩.২ (ক) প্রবেশনের প্রেক্ষাপট

"প্রবেশন" জনপ্রশাসন শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "প্রবেশন" শব্দটির দ্বারা সাধারণত সরকারী সংস্থাগুলিতে কর্মী নিয়োগের পদ্ধতিকে নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ সরকারী পদপ্রার্থীকে খুঁজে বার করা এবং যোগ্যতম ব্যক্তিকে সরকারী দায়িত্বভার প্রদান করার পদ্ধতিকে প্রবেশন পদ্ধতি বলে গণ্য করা হয়। কাজেই কর্মী নিয়োগ করা প্রশাসনের একটি অতি জটিল দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কর্মী নিয়োগ বা প্রবেশন সামন্ততান্ত্রিক যুগে সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মৌর্য, গুপ্ত বা মোঘল সম্রাটগণ, শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগে যত্নবান হতেন। প্রয়োজনে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে কর্মী নিয়োগ করতেন এবং সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য সম্পাদনে তাদের সাহায্য গ্রহণ করতেন। এই সকল সম্রাটগণ, উচ্চপদ বা দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য রাজ পরিবারের বিভিন্ন সদস্যকে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করতেন। ফলে পেশাদারী প্রশাসকের প্রয়োজনীয়তা তখনও অনুভূত হয়নি।

ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক স্তরে, ইংরেজ সরকার ইংল্যান্ডবাসী কৃত্যকগণকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তি বলে গণ্য করতেন এবং রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার তাদের হাতেই অর্পণ করা হত। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারই নানা কারণে এই পদ্ধতিটি বাতিল করতে বাধ্য হন এবং বৈজ্ঞানিক, বাস্তবানুগ পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে "চুক্তিবদ্ধ চাকুরি" ব্যবস্থা বা "Covenanted Service"-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়, এবং সীমিত ভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রকোপে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মীগোষ্ঠির পদ ভারতীয় নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। সেই সময় থেকেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা কৃত্যক নিয়োগের সরকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন সাধন করা হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় সংবিধান সংস্কারের জন্য যে নথিপত্র রচিত হয় (Despatch), এই নথিপত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক দিক থেকে নিরপেক্ষ কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নথিপত্রে সরকারী কর্মচারীদের প্রবেশনের প্রয়োজনে একটি নিরপেক্ষ সরকারী সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে

রাষ্ট্রকৃত্যক গঠনের উদ্যোগ শুরু হয় এবং ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন গঠন করা হয়। এই সময়ই প্রবেশনের পদ্ধতি পাকাপোক্তভাবে গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন ভারতে সরকারী কর্মীগোষ্ঠির নিয়োজন পদ্ধতির সামান্য রদবদল করা হয়, তবে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সুপারিশে কর্মী নিয়োগের আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন পদে প্রয়োজনীয় কর্মী প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কে নির্ধারিত নীতি গ্রহণ করা হয়।

সরকারী সংস্থাগুলির কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি বেসরকারী সংস্থাগুলি থেকে আলাদা। সাংবিধানিক প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, এই সকল বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারী কর্মীর নিয়োগ এবং প্রবেশনের পদ্ধতি স্থির করা হয়। সুস্থ এবং ত্রুটিবিহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম চীন দেশে অনুভব করা হয় এবং সেই সময় থেকেই চীনে মেধাভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের প্রচলন ঘটে। ভারতে মেধাভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি ১৮৫৩ সালে প্রথম চালু করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক পারিতোষিক নিয়োগ ব্যবস্থার (Spoils System) ত্রুটিগুলি দুর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এবং মেধাশক্তির বিচারের মাধ্যমে সরকারী কর্মী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। এই বছরই লর্ড চার্লসউড লর্ড মেকলের সভাপতিত্বে এবং Board of Commissioners-এর তৎপরতায় "মেকলে কমিটি" গঠন করা হয়। এই মেকলে কমিটির তত্ত্বাবধানে পার্লামেন্টে রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন পাশ করা হয়। মেকলে কমিটি কেবলমাত্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের জন্যই সুপারিশ করেননি, পরীক্ষার পাঠ্যক্রমও নির্ধারণ করেন। যদিও স্বাধীন ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রবেশন পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। তবে একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পদ্ধতি অবলম্বনের পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনিক চিন্তাধারার প্রভাব অনস্বীকার্য।

আধুনিক প্রশাসনবিদগণ এই প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিকে প্রবেশনের অন্যতম পদ্ধতি বলেই গণ্য করেন। কারণ তারা প্রবেশনের এই নীতিকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। এই সকল প্রশাসনবিদদের মতে এই পদ্ধতিতে যোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সরকারী প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনের সুযোগ পান এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সরকারী কার্যভার পরিচালনা করতে সক্ষম হন। প্রশাসনিক দায়িত্বভার সৃজনশীল নাগরিকদের হাতে প্রদান করার সম্ভাবনা আরও বেশি ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রশাসনিক কর্মীগণ উচ্চমানের নাগরিককে প্রশাসনিক কাজের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে সুচারু বিজ্ঞপ্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি করেন এবং সেইদিকে নজর রেখে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যে পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশাসনিক সংস্থাগুলিতে প্রবেশনের জন্য প্রার্থী আহ্বান করা হয় তা এরূপ—

ক) রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রবেশনের জন্য কর্মসংস্থানের বাজার উদ্ভাবন ও অনুশীলন।

খ) আকর্ষণকারী নিয়োগ বা প্রবেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের ব্যবস্থা।

গ) প্রার্থীদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য যাচাই করার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষার প্রচলন।

ঘ) বিভিন্ন সংস্থাগুলির জন্য কৃত্যক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খুঁজে নেওয়া।

ঙ) উপযুক্ত কর্মসূচি নির্ধারণ করা এবং যথাযোগ্য ব্যক্তিকে যথাস্থানে নিয়োগ করা।

চ) শিক্ষাধীন কর্মসূচীকে নিয়োগ পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গণ্য করা।

৩.২.১ (ক) নিয়োগ পদ্ধতি

ভারতে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে দুটি পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে — (১) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি, (২) বিভাগীয় ভিত্তিতে পদোন্নতির পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে মেধাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে কর্মের বাজার থেকে তুলে আনা হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিভাগীয় কর্মীদের মধ্যে থেকে যোগ্যতম ব্যক্তিকে খুঁজে বার করা হয়। অর্থাৎ প্রথম পদ্ধতিটির এলাকা বিস্তৃত হলেও দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রবেশনের এলাকা অত্যন্ত সীমিত থেকে যায়। প্রথম পদ্ধতিতে পদপ্রার্থীগণ জটিল পরীক্ষা ব্যবস্থার সম্মুখীন হলেও দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থী যাচাই করার প্রয়োজন হয় না।

তিনটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীকে বিভিন্ন উচ্চপদে প্রবেশনের সুযোগ প্রদান করা হয় — (১) মেধার মাধ্যমে প্রবেশন, (২) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পদোন্নয়ন বা উচ্চস্তরে প্রবেশন, (৩) অভিজ্ঞতা এবং মেধা এই উভয় প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণের পদোন্নয়ন।

৩.২.২ (ক) নিয়োজনের যোগ্যতাসমূহ

রাষ্ট্রকৃত্যক পদের নিয়োজনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণের যে পন্থা অলম্বন করা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রকৃত্যকের যোগ্যতাই জনপ্রশাসনের ভবিষ্যৎ। কাজেই রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রবেশনের পূর্বে যোগ্যতা নির্ধারণের দিকে বিশেষ নজর করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রবেশনের যোগ্যতাবলী সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় — (১) সাধারণ যোগ্যতা (২) বিশেষ যোগ্যতা।

সাধারণ যোগ্যতাবলীর মধ্যে রয়েছে— (১) নাগরিকত্ব, অর্থাৎ রাষ্ট্রকৃত্যকের পদপ্রার্থীগণ অবশ্যই ভারতের নাগরিকরূপে চিহ্নিত হবেন।

বাসস্থান ঃ ইদানীংকালে প্রার্থীর বাসস্থান সংক্রান্ত প্রমাণপত্রের নীতি অবলম্বন করা হয়েছে অর্থাৎ কোন প্রার্থীর কোন এলাকায় স্থায়ী বাসিন্দা তা দেখে নিতে হবে এবং তাকে সেই এলাকাভুক্ত কৃত্যকের

পদে গ্রহণ করা হবে। এখানে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাসস্থানের প্রমাণপত্র প্রবেশনের সময় পেশ করতে হয় এবং সেই অনুসারে তার কর্মসংস্থানের এলাকা নির্ধারণ করা হয়।

লিঙ্গ ঃ ভারতবর্ষে এখনও এমন কিছু সংস্থা রয়েছে যে সকল সংস্থায় প্রবেশন পুরুষ নাগরিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সেই সকল সংস্থায় কোন মহিলা নাগরিকের প্রবেশন সম্ভব হয়। যেমন সীমানা রক্ষক বাহিনীর (BSF) কাজে মহিলাগণকে নিয়োগ করা হয় না।

বয়স ঃ রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রবেশনের বয়স প্রাক্ ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে ছিল ২১-২৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত। তবে ১৯৭৯-এর পর থেকে কর্মীবৃন্দের প্রবেশনের বয়স ২৮ বৎসর করা হয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্মী নিয়োগের নিয়মাবলীর মধ্যে অন্যতম। যদিও বিভাগীয় কৃত্যকগণকে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ওপর জোর দেওয়া হয়, তেমনি কারিগরী ক্ষেত্রে প্রবেশনের ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। বিশেষীকৃত যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে পেশাদারী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানী প্রভৃতি। এই সকল প্রযুক্তিবিদগণের প্রবেশনের পদ্ধতি রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রবেশন পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে রাষ্ট্রকৃত্যকের পদপ্রার্থী কারিগরীবিদগণকে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে নিয়োগ করা হয়।

বিশেষ যোগ্যতাবলীর মধ্যে সততা, উপস্থিত বুদ্ধি, ব্যবহারে দক্ষতা, উপায় উদ্ভাবনে দক্ষতা, বিশ্বস্ততা বা নির্ভরযোগ্যতা, সময়ানুবর্তিতা এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি চরিত্রের নৈতিকশক্তি একজন কৃত্যককে ক্ষমতাবান কর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

৩.২.৩ (ক) যোগ্যতা নির্ধারণের পদ্ধতি

যেহেতু পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে উক্ত পরিচ্ছেদে পদোন্নয়নের মাধ্যমে প্রবেশনের পদ্ধতিটি আলোচনা করা হল। এই পদ্ধতিতে কৃত্যকের কর্মগত যোগ্যতার ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কাজেই উক্ত অধ্যায়ে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতিগুলি নির্দেশ করা হল — (ক) নিয়োগকারী অফিসারের ব্যক্তিগত বিচার, (খ) সক্ষমতা, চরিত্র এবং শিক্ষার সার্টিফিকেট, (গ) শিক্ষাগত এবং পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা ইত্যাদি। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার লিখিত বিবৃতি প্রবেশনের একটি উল্লেখযোগ্য নীতি বলে মনে করা হয়।

নিয়োগকারী বা কৃত্যকের ব্যক্তিগত বিচার ঃ প্রবেশনের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কৃত্যকের ব্যক্তিগত অভিমত একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রার্থী সংখ্যা কম হলে এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অভিমত কার্যকরী হয়। কিংবা পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদে নিয়োজিত হলে এই পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা হয়। সাধারণত উচ্চপদ গ্রহণকারী কৃত্যকগণকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

(২) যোগ্যতার ব্যক্তির দ্বারা প্রার্থীর ব্যক্তিগত সক্ষমতার লিখিত বিবৃতি, পূর্ববর্তী নির্দেশকর্তার মতামত সম্পর্কিত বিবৃতি তখনই কার্যকরী হয়, যখন নিয়োগকারী কৃত্যকের কোনরকমের নেতিবাচক মনোভাব না থাকে। প্রবেশনের ক্ষেত্রে প্রশাসকের নিরপেক্ষতা লিখিত বিবৃতি প্রদানে সাহায্য করে।

৩.২.৪ (ক) নিয়োগ বা প্রবেশনের সমস্যাবলী

রাষ্ট্রকৃত্যকের বিভিন্ন পদে যোগ্য এবং সঠিক ব্যক্তির প্রবেশনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। সেই সমস্যাগুলি হল —

(১) নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিয়োগ বা প্রবেশন বনাম পদোন্নয়নের মাধ্যমে নিয়োগ বা প্রবেশন নিয়ে মতানৈক্য।

(২) কর্মীবৃন্দের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী নিয়ে সমস্যা।

(৩) যোগ্যতাবলী নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে সমস্যা।

(৪) নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অবস্থিতি বা স্থান নিয়ে সমস্যা।

এই সকল সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান যেহেতু সম্ভব নয় সেইহেতু প্রবেশনের জটিলতা দূর করাও এইক্ষেত্রে অসম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। তবে প্রবেশনের পদ্ধতিগুলি স্থানবিশেষে বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

প্রথম পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এই পদ্ধতিতে কোনরূপ বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করা হয়নি বলেই মনে করা হয়। তবে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণের স্বজন পোষণমূলক মনোভাব এবং মন্ত্রীগণের দলগত প্রভাব অনেক সময় এই ধরনের প্রবেশনের পদ্ধতিকেও ত্রুটিপূর্ণ করে তোলে। কাজেই প্রত্যক্ষ নিয়োগ পদ্ধতিতে নিয়োগকারী কৃত্যকগণ এবং রাজনৈতিক দলনেতাগণ উভয়েই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টিকে গ্রহণ করতে সক্ষম না হলে প্রবেশন ব্যবস্থার সৃষ্ট পদ্ধতিগুলি মেধাশীল সরকারী কৃত্যকের নিয়োগের কাজে ব্যবহৃত হয় না।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে উচ্চপদে প্রবেশন বিভাগীয় কর্মীবৃন্দের মধ্যে থেকে হয়. ফলে প্রবেশনের এই পদ্ধতি একজন কৃত্যকের কর্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে।

(৩) এই ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ডিগ্রীধারী দেশের শ্রেষ্ঠ এবং মেধাবী তরুণ কর্মীদের আকর্ষণ করা সম্ভব হয়।

(৪) এই পদ্ধতির মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সরকারী কাজে আকর্ষণ করা সম্ভব।

(৫) এই ধরনের প্রবেশন পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মীগণ দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম হন। তাছাড়াও এই পদ্ধতির মাধ্যমে যেহেতু

সক্ষম যুবকগণকে আকর্ষণ করা হয়, ফলে এই সকল কৃত্যকগণ সরকারের সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কার্যাবলীকে গতিশীল করে তুলতে সক্ষম হন এবং সরকারের সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

৩.২.৫ (ক) পদোন্নয়নের গুণাগুণ

(১) এই ব্যবস্থায় নিয়োজিত কৃত্যকগণ সরকারী ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কাজেই এই অভিজ্ঞতা তাদেরকে নতুন করে দায়িত্ব নিতে সহায়তা করে, ফলে দক্ষতা, সমর্থন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেন।

(২) এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে উন্নতির সুযোগ করে দেয়। উন্নতির পথ খোলা থাকার ফলে রাষ্ট্রকৃত্যকগণ দক্ষতা এবং আনুগত্যের সাথে তাদের ওপর ন্যস্ত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। এই ব্যবস্থার ফলে কার্যে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য যেমন কর্মীগণকে পুরস্কৃত করা হয় তেমনি কার্যে অবহেলা করার জন্য শাস্তিও দেওয়া হয়।

(৩) তরুণ ব্যক্তির কর্মজীবন উন্নতি আনয়নের জন্য এই পদ্ধতিটি অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়। L. D. White-এর মতে "An occupation which one normally takes up in youth with the expectation of advancement and pursues until retirement." — অর্থাৎ কোন একজন অল্পবয়স্ক ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রকৃত্যকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি যদি সচেতন থাকেন যে, এই ব্যবস্থায় চাকুরীতে উন্নতির পথ খোলা রয়েছে তবে তিনি অবসরগ্রহণ পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সরকারী দায়িত্ব পালন করেন।

তবে উভয় প্রক্রিয়াই সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রত্যক্ষ প্রবেশনের ক্ষেত্রে যেমন প্রবেশকের নিরপেক্ষতা এবং মন্ত্রীগণের রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হওয়া আবশ্যক তেমনি পদোন্নয়নের ক্ষেত্রেও যে সকল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় তা এরূপ —

(১) এই ব্যবস্থায় অভিজ্ঞতার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী প্রতিভাধরগণ উপেক্ষিত হন। একজন কর্মীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মক্ষমতাও সীমিত হয়। ফলে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মীগণ অনেক সময়েই কর্মদক্ষতা প্রদর্শনে অক্ষম হন। ফলে সরকারী কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না।

(২) অবশ্যম্ভাবী পদোন্নতির সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে একজন কর্মীকে অক্ষম করে তোলে।

(৩) কর্মে প্রতিযোগিতার অভাব অনেক ক্ষেত্রে কর্মীগণকে অনুৎসাহী করে। ফলে সরকারী কাজকর্মের গতিশীলতা নষ্ট হয়।

L. D. White — Government Career Service - P. 7.

কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা এবং মেধাভিত্তিক পদোন্নয়ন (Seniority-Cum-Merit) ঃ এই ব্যবস্থায় একজন কর্মীর মেধার সঙ্গে কর্মীর কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার পরিমাপ নির্ণয় করে কর্মীর পদোন্নতির সুযোগ করে দেওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এই ব্যবস্থা একজন কর্মীকে সুযোগ্য কৃত্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। কাজেই জনপ্রশাসনবিদ্‌গণের মধ্যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নয়ন কৃত্যকের সরকারী কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেধাশক্তির ভিত্তিতে পদোন্নয়ন পদ্ধতি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

৩.৩ (ক) সারাংশ

বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারী কৃত্যকগণকে নিয়োগ করা হয়। মেধাভিত্তিক প্রবেশন এর মধ্যে অন্যতম। সাধারণত প্রবেশনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকা প্রয়োজন। তবে, কোন প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, পরিচালন ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি এই সকল বিষয় বিশ্লেষণ করে সাধারণত প্রার্থী নিয়োগ করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে পদোন্নয়নের মাধ্যমে প্রবেশন সম্ভব ; তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মক্ষমতাই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পদোন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। উক্ত এককে প্রবেশনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল।

৩.৪ (ক) অনুশীলনী

(১) শিক্ষানবিশি পর্যায়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করুন।

(২) স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যকের শিক্ষানবিশি পর্যায়ের পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(৩) শিক্ষানবিশি পর্যায়ের গুণাগুণ এবং সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(৪) আপনি কি মনে করেন যে শিক্ষানবিশ থাকাকালীন উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করলে একজন সুপ্রশাসক নিয়োগ করা সম্ভব ?

৩.৫ (ক) গ্রন্থপঞ্জী

1. Dahste – *Public Administration.*
2. Sriram Maheswari – *Indian Administration.*
3. M. P. Sharma – *Public Administration.*

একক ৩ (খ) □ প্রশিক্ষণ

গঠন (খ)

৩.০ (খ) উদ্দেশ্য

৩.১ (খ) প্রস্তাবনা

৩.২ (খ) প্রশিক্ষণ

- ৩.২.১ (খ) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
- ৩.২.২ (খ) প্রশিক্ষণের রূপ
- ৩.২.৩ (খ) সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকগণের প্রশিক্ষণ
- ৩.২.৪ (খ) প্রশাসনের অন্তর্বর্তী প্রশিক্ষণ

৩.৩ (খ) সারাংশ

৩.৪ (খ) অনুশীলনী

৩.৫ (খ) গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ (খ) উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনারা জানতে পারবেন যে রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? এবং একজন রাষ্ট্রকৃত্যক প্রবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কি ধরনের প্রশিক্ষণের সম্মুখীন হন —

- উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য;
- প্রশিক্ষণের রূপ;
- সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের প্রশিক্ষণ;
- প্রশাসনের অন্তর্বর্তী প্রশিক্ষণ।

৩.১ (খ) প্রস্তাবনা

প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার প্রয়াসে, প্রশাসনিক কর্মীগণকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করা হয়। এই পরিচিতি পর্ব বিভিন্ন উপায়ে হয়ে থাকে। কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের

মাধ্যমে, কখনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ভাবে, আবার কখনও বিভিন্ন সেমিনার বা বক্তৃতার মাধ্যমে। এই এককে, প্রশাসকগণের প্রশিক্ষণের এই পদ্ধতিগুলির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.২ (খ) প্রশিক্ষণ

আধুনিককালে সরকারী কর্মচারীর প্রশিক্ষণ জনপ্রশাসন তত্ত্বের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সনাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কেবলমাত্র সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের ক্ষেত্রেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রচলিত ছিল। অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ হাতে-কলমে সরকারী কার্যভার পরিচালনার রীতিনীতিগুলি শিখে নিতেন।

ইদানীংকালে সরকারের প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারী কর্মচারীর কাজের ব্যাপ্তিও বেড়েছে। এই নবপ্রণোদিত সরকারী কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনে সরকারী কর্মচারীগণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করাই উক্ত অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। আভিধানিক অর্থে "প্রশিক্ষণ" বলতে কোন বৃত্তি, চারুকলা, কারিগরীবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা করাকেই বোঝায়। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ হল কর্মনৈপুণ্য বৃদ্ধি বা জ্ঞানবৃদ্ধি অর্থাৎ মনোভাবের এবং অভ্যাসের উন্নতিকরণ। সরকারী ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল সরকারী কাজে নিযুক্ত কর্মীবৃন্দের ওপর প্রত্যাশিত দায়িত্বভার সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষমতা গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে William G. Tarpey-র বক্তব্য এরূপ— "Training is the process of developing skills, habits, knowledge attitudes, in employees for the purpose of increasing the effectiveness of employees in their present of government positions as well as preparing employees for future government position.[1]" অর্থাৎ Tarpey-র মতে 'প্রশিক্ষণ' একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কোন বৃত্তির উন্নতি সাধন করা, অভ্যাস, জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা এবং কর্মচারীর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করা।

আবার Avasthi and Maheswari প্রশিক্ষণের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রশিক্ষণের ফলে সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মচারীদের বৃত্তির প্রতি নৈপুণ্য বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন, কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ সুস্থ পথে চালিত করা সম্ভব অর্থাৎ Training is the conscious effect-made to purpose and increase employees skill and intelligence and to develop his attitudes and schemer of values in a desired direction.[2] আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই একথা মন্তব্য করেন যে, প্রকৃত প্রশিক্ষণের ফলে সরকারী কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয়।

1. Tarpey W. G. — Public Personal Management. p. 154.
2. Avasthi and Maheswari — Public Administration. p. 357.

৩.২.১ (খ) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

প্রশিক্ষণের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে, সরকারী কর্মচারীর প্রশিক্ষণ কমিটি অর্থাৎ Asheton Committee[3] ১৯৪৪ সালে "British Chancellor of Exchequer-এর সমীপে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মন্তব্য করেন যে. At this outset we asked ourselves the question "What is the object of Training of the answer is to achieve the greatest possible degree of efficiency, then the word 'efficiency' seems to need some closer definition. In any large scale organisation efficiency depends on two elements, the technical efficiency of the individual to do a particular work allotted to him and the less tangible efficiency of the organisations as a corporate body desired from the collective spirit and outlook of the individuals of which the body is composed. Training must have regards to both elements." অর্থাৎ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেলে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধিই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা শব্দটি প্রশিক্ষণের দুটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে— (১) কারিগরী ক্ষমতার ব্যান্ডি মটাকা। (২) সরকারী কার্যাবলীর বিস্তারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

Asheton Committee প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রশিক্ষণের পাঁচটি বিশেষ উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করেন।

(১) প্রশিক্ষণের ফলে একজন সরকারী কর্মচারী প্রশাসনিক বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে পারেন।

(২) প্রকৃত প্রশিক্ষণ একজন প্রশাসককে পরিবর্তনশীল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিয়ত খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে. নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টু এবং সময়োচিত সমাধান করতে সক্ষম করে।

(৩) সনাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একজন সরকারী কর্মচারী প্রতিনিয়ত একই ধরনের কার্যভার পরিচালনা করেন ফলে একটি কৃত্রিম যন্ত্রে পর্যবসিত হন। কিন্তু একজন প্রকৃত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশাসক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিয়ত খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম হন এবং সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তারা সরকার পরিচালিত উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে যত্নবান হন। কাজেই দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার প্রয়োজনেও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

(৪) আবার কেবলমাত্র পেশাগত প্রশিক্ষণের ফলে প্রকৃত কর্মী নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কর্মগত প্রশিক্ষণ একজন কর্মীকে তার প্রয়োজনীয় দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনে জটিলতর সমস্যা বা দায়িত্বভার সুপটু হস্তে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

3. Report of the Committee on the Training of Civil Servants, London, HMSO 1944, pp. 10-11.

(৫) সরকারী সংস্থাগুলিতে এখনও এমন অনেক কাজ রয়েছে যা পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। কিন্তু এই অপরিবর্তনীয় সরকারী কাজও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। প্রশিক্ষণ কর্মীবৃন্দের মানসিকতার উন্নতিতে সাহায্য করে[4]।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য : প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

(ক) প্রশিক্ষণের ফলে একজন নবনিযুক্ত কর্মীর ব্যক্তিগত ক্ষমতার সঙ্গে, পরিকল্পিত ক্ষমতার যুগ্ম প্রকাশ ঘটে এবং তার ফলে কার্যাবলী সম্পর্কে তার একটি যুগ্ম ধারণা গড়ে ওঠে। তিনি তার বিভাগীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন।

(খ) প্রশিক্ষণ, সরকারী কার্যাবলীর পরিবর্তনের সঙ্গে একজন প্রশাসককে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে। যদিও বৃহত্তর লক্ষ্যগুলি আইনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তবে সূক্ষ্মতর কিছু পরিবর্তন প্রতিনিয়তই ঘটে থাকে। এই ধরনের পরিবর্তিত পরিবেশের মুকাবিলা করা প্রকৃত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশাসকের পক্ষে সহজসাধ্য হয়।

(গ) প্রশিক্ষণের ফলে সরকারী নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হয়। সরকারী কৃত্যকগণ দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োজনগুলিকে মিটিয়ে নিতে পারেন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলিকে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিকভাবে চালিত করতে পারেন।

(ঘ) সরকারী চাকুরীতে কিছু বিশেষ ধরনের জীবিকা রয়েছে যা সমসাময়িক আর কোন সংস্থায় স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন তটরক্ষক, অগ্নি নির্বাপক, খাদ্য পরিবেশক, এই সকল কার্যাবলী সরকার দ্বারা পরিচালিত। এই সকল বিশেষ ধরনের কাজে প্রশিক্ষণকে জীবিকার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয়।

(ঙ) আধুনিককালে শিক্ষা এবং জ্ঞানগত জগতে যুগান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত প্রশিক্ষণের ফলে কর্মীগণ এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম হয়।

(চ) প্রশিক্ষণের ফলে একজন কর্মী জনমুখী প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হন। প্রতিটি স্তরেই তাদের চিন্তা-ভাবনা অনেকটা মানব সম্পর্কের (Emotionally integrated) সঙ্গে তাল রেখে গড়ে ওঠে। ফলে প্রশাসনের জনকল্যাণমূলক কার্যসূচিগুলির উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা সহজ হয়।

এই মর্মে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের Asheton Committee-র মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিটির মতে যদি রাষ্ট্রকৃত্যকগণ এবং জনগণ উভয়েই নিজেদেরকে দুই মেরুর নাগরিক বলে মনে করেন, তবে উভয়ের মধ্যে একধরনের নাশকতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। একজন

4. Report of the Committee on the Training of Civil Servants, London, HMSO 1944, pp. 10-11.

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশাসক এই ধরনের মনোভাব সহজেই বর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি জনগণের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হন এবং সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বকে পালন করার ফলে সুষ্ঠু প্রশাসনিক পরিকাঠামো গঠিত হয় (Report of the Committee) এবং প্রতিটি সমস্যার সমাধান অতি সহজে করা সম্ভব হয়।[5]

(ছ) প্রশিক্ষণের ফলে নাগরিকগণের দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। কারণ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল থাকেন এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের অবদান সম্পর্কে সচেতন হন। Nigro-র[6] ভাষায় প্রশিক্ষণের ফলে কর্মীগণের বহিরঙ্গ পারদর্শিতার বিকাশই ঘটে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে।

(জ) প্রশিক্ষণের ফলে উচ্চপদের এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃত্যকগণ সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হন এবং জনউন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

(ঝ) প্রশিক্ষণের ফলে অল্পবয়স্ক নাগরিকগণেরও তাদের ওপর ন্যস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ফলে তাদের উন্নতির পথ সুগম হয় এবং কৃত্যকগণ উন্নত ধরনের দায়িত্ব গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেন না।

(ঞ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃত্যকগণের উপস্থিতিতে সরকারী সংস্থাগুলি উন্নততর হয়। ফলে বিভাগীয় দক্ষতা এবং সুনাম বৃদ্ধি পায়। দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয় এবং কর্মীবৃন্দের মানসিক বিকাশ সম্ভব হয়।

(ট) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীগণের উপস্থিতির ফলে কল্যাণমূলক সরকারের সঙ্গে জনগণের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(ঠ) প্রশিক্ষণের ফলে দৃষ্টিভঙ্গির একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়, কাজের প্রতি অনীহা দূর হয়। কর্মীবৃন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে এবং নির্ভয়ে তার দায়িত্ব পালন করেন।

৩.২.২ (খ) প্রশিক্ষণের রূপ

ভারতীয় কৃত্যকগণের প্রশিক্ষণ সাধারণত দুইটি পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত— (ক) আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (Formal Training) এবং (খ) অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (Informal Training)। নিয়মানুবর্তিতার বশবর্তী হয়ে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তাকে বলা হয় Formal Training বা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ। সাধারণত সরকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যকগণের প্রশিক্ষণের রীতিকে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বলা হয়। আবার যে প্রশিক্ষণ কর্মীগণ কার্যকালে নিজেদের দায়িত্বভার পরিচালনের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেন তাকে অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা Informal Training বলা হয়।

---

5. ibid.
6. Nigro Felix — Public Reading and Documents.

অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সাফল্য এবং কার্যকারিতা সাংগঠনিক কর্তৃপক্ষের মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। কর্তৃপক্ষ কর্মীগণকে কাজ করার প্রকৃত পরিবেশ প্রদান করছেন কি না। কর্মীগণের মধ্যে কার্য পরিচালনার প্রকৃত মনোভাব রয়েছে কি না; নবনিযুক্ত কর্মীগণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন কি না; কর্মী এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কি না; বিভাগীয় প্রধান তার কৃত্যক সম্পর্ক ওয়াকিবহাল কি না। এই সকল বিষয়ে যত্নবান হলে অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সহজসাধ্য হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এইভাবেই কর্মীগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ব্রিটিশ শাসনাধীন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনেকটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে পরিচালিত হত। একজন নবনিযুক্ত কর্মীকে একজন প্রশাসনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত করা হত। তাকে প্রশাসক বা জেলাশাসকের গৃহে আহ্বান করা হত। জেলা পরিদর্শনে তাকে জেলাশাসকের সঙ্গে নেওয়া হত, অর্থকরী আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি কর্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এইভাবে তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পন্ন করার অভ্যাস গড়ে উঠত। এক্ষেত্রে একজন জেলা-প্রশাসকই হলেন নবনিযুক্ত কর্মীর প্রকৃত প্রশিক্ষক। Gorwala-র মতে একজন সৎ জেলা-প্রশাসকের গৃহ একজন জেলা উপশাসকের দ্বিতীয় গৃহ[7] উভয় কর্মীর মধ্যে এই ধরনের আত্মিক সম্পর্ক একজন নবনিযুক্ত কর্মীকে দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহী করত এবং তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করত। আমরা অনেক সময়ই বলি যে, অমুকবাবুর কাছে আমার শিক্ষার হাতেখড়ি। উনিই আমাকে হাতে কলমে কাজ শিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ ওনার সাহচর্য আমাকে কাজে উদ্দীপিত করেছে। আমার শিক্ষা অর্থাৎ আমার কাজের উদ্দীপনার পেছনে এই ব্যক্তির অবদান আমাকে উক্ত প্রশাসকরূপী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছে। কাজেই উচ্চস্তরের কার্যভার পরিচালনা করতে হলে একজন কর্মীর পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সহকর্মীদের উষ্ণ ভালবাসা প্রশাসনিক কর্মীর জীবন সার্থক করে। Travelyan ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের আবর্তন এবং উন্নয়ন (Rise and Evolution) সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে প্রকাশ করেন যে, একজন রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রকৃত প্রশিক্ষণের শুরু হয় তার কাজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এর ফলে কর্মীর মধ্যে অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে প্রকৃত দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও কোন প্রশিক্ষকেরই প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় না। তার কাজের বিভিন্নতা, কাজের প্রতি আকর্ষণ এবং একজন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ভ্রাতৃস্নেহ এবং সমমর্যাদা প্রদান, কার্যভার পরিচালনার পদ্ধতির প্রশিক্ষণ ইত্যাদি একজন কর্মীকে প্রকৃত প্রশিক্ষণ দিতে সাহায্য করে[8]।

তবে অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে একজন প্রশিক্ষকের কারিগরীবিদ্যার উন্নতি প্রকল্পে এবং প্রচলিত আইন এবং রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতন শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। কাজেই প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত প্রশিক্ষণের সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষণ

7. Avasthi and Maheswari — Public Administration, p. 349.
8. Avasthi and Maheswari — Public Administration, p. 349.

এবং গোষ্ঠী আলোচনার (Lecturer and Group Discussion) মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের আয়োজনও করা হয়।

ভারতবর্ষে, সরকারী কর্মীবৃন্দের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রাক্ কতগুলি স্তর বিভাগ রয়েছে যেমন, (১) প্রাক্-প্রবেশ প্রশিক্ষণ (Pr-entry Training), (২) প্রবেশিকা প্রশিক্ষণ (Orientation Training), (৩) প্রবেশোত্তর প্রশিক্ষণ (Post-entry Training)।

(১) প্রাক্-প্রবেশ প্রশিক্ষণ ঃ এই ধরনের প্রশিক্ষণ সাধারণত বেসরকারী বা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করে থাকে। যেমন বিভিন্ন ধরনের কারিগরী শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সাধারণত প্রাক-প্রবেশ প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন— ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, আইন, কম্পিউটার প্রভৃতি বিষয়ের ওপর সাধারণত প্রাক্-প্রবেশ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে আধুনিক যুগে ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথেই এই ধরনের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে এখনও কিছু কিছু চাকুরীতে এই ধরনের প্রাক্-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়নি।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে রাজস্থান সরকার একটি Junior Diplomatic Course in Secretariate and Business Training শুরু করে এবং এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনগণের মধ্যে যে সকল সদস্য ৬৫ শতাংশের ওপর নম্বর পান তাকে Upper Division Clerk বা বিভাগীয় উচ্চ করণিকের চাকুরীতে বহাল করা হয়।

(২) অন্তর্বর্তী প্রশিক্ষণ ঃ এই ধরনের প্রশিক্ষণ চাকুরীতে যোগদান করার পর থেকেই চলতে থাকে। সাধারণত অল্প সময়ের জন্য অর্থাৎ দুই কিংবা তিন সপ্তাহের জন্য এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিভিন্ন আলোচনা সভা বক্তৃতা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে একজন কৃত্যককে সরকারী কার্যাবলী পরিচালনার রীতিনীতি সম্পর্কে পরিচিত করা হয়।

(৩) প্রবেশোত্তর প্রশিক্ষণ ঃ এই ধরনের প্রশিক্ষণ কিছু বিশেষ ধরনের চাকুরীজীবিদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেমন— সামরিক বাহিনীতে যোগদানকারী কর্মীর প্রশিক্ষণ, ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকগণের প্রশিক্ষণ, পুলিশ কৃত্যকের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

৩.২.৩ (খ) সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকগণের প্রশিক্ষণ

সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এ. কে. চন্দ। তাঁর মতে এই ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে কৃত্যকগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আঞ্চলিক সরকারগুলির সমন্বয় রেখে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারেন। তবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুটি সরকারের সমন্বয় গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কাজেই আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন সেমিনার বা আলোচনা সভা, নিজেদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৫৯ সাল থেকে এই ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের কাজ শুরু হয়।

অন্যদিকে সুসংবদ্ধ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই স্বাধীন ভারতীয় সরকার, সর্বভারতীয় কৃত্যক, পুলিশ কৃত্যক এবং কেন্দ্রীয় কৃত্যকগণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। মেটকাফ হাউসে অবস্থিত IAS Training School এবং সিমলায় অবস্থিত IAS Staff College কে এই ধরনের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে এই দুই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিলুপ্ত করে National Academy of Administration নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। তবে ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে Lal Bahadur Sastri Academy Administration-এ, রাষ্ট্রকৃত্যকগণের জন্য একটি সুসংহত এবং মৌখিক পাঠ্যক্রম চালু করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ পাঁচ মাস। তবে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সর্বভারতীয় কৃত্যকগণের ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় কৃত্যকে নিযুক্ত হওয়া প্রশাসকগণেরও প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা Lal Bahadur Sastri National Academy of Administration-এ আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণের নাম দেওয়া হয়েছে Foundation Course অর্থাৎ ভিত্তিপ্রস্তর পোক্ত করার উদ্দেশ্যে এই প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই কোর্স প্রশাসকগণকে নিরপেক্ষ এবং দায়িত্বসম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। এই Foundation Course সমাপ্ত হলে, এই সকল কর্মীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠান হয়।

অবশ্য সর্বভারতীয় কৃত্যকগণ পেশাগত কোর্সের পরীক্ষায় বসেন। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে Sandwich Course-এ পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থা ১৯৬১ সাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। একজন রাষ্ট্রকৃত্যক এই কোর্সে কৃতকার্য হলে বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ করা হয় এবং এইসব রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা করার মাধ্যমে একজন প্রশাসক হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেন। রাজ্য প্রশাসনের মেয়াদকাল এক বৎসর, সেই সময় প্রশাসকগণ মতামত আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হন এবং প্রশাসন সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যার আলোচনা করেন।

ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক (Indian Police Service) ঃ পুলিশ কৃত্যকগণের প্রশিক্ষণের জন্য রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে একটি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। ১৯৭৫ সালে হায়দ্রাবাদে তা স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রের নাম পুলিশ একাডেমি। তবে এই পুলিশ একাডেমিতে প্রবেশের পূর্বে পুলিশ কৃত্যকগণ সাধারণ বিষয় বা ভাবা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পুলিশ একাডেমিতে এই কৃত্যকগণকে ফৌজদারী আইন, দণ্ড আইন, সাক্ষ্য আইন এই সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হয়। তাছাড়াও, এই কৃত্যকগণ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার পদ্ধতি ডিলিং-এর প্রশিক্ষণ, অপরাধ মনস্তত্ত্ব, অপরাধ নির্ণয়, অপরাধীকে খুঁজে বের করার পদ্ধতি, এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ভারতীয় বিদেশ কৃত্যক (Indian Foreign Service) ঃ বিদেশ কৃত্যকগণের জন্য বিস্তারিত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এই সকল কৃত্যকগণও লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একাডেমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তবে এদের ক্ষেত্রে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তারা ন্যাশনাল একাডেমিতে চার মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনীতি,

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে তিন মাস ধরে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এক বৎসর বিদেশ মন্ত্রকের অধীনে তৃতীয় সচিবের পদে কাজ করেন এরপর তাকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়।

৩.২.৪ (খ) প্রশাসনের অন্তর্বর্তী প্রশিক্ষণ (In Service Training)

এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল একজন কর্মীর কর্মদক্ষতার সদ্ব্যবহার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা। সাধারণত আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রকৃত পরিকাঠামো গঠন করার কিছু সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে কর্মী পরিচালনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। আমাদের দেশে ব্রিটিশ পরিকাঠামোর ওপর নির্ভর করে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরই রাষ্ট্রকৃত্যকের কর্মীগণের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে Administrative Staff College for Educational Planners & Administration, New Delhi ; Central Emergency Training Institute, Nagpur ; Customs and Central Excise Training School, New Delhi ; Indian Audit and Accounts Staff Training College, Simla, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Foundation Course, Professional Training, Practical Training, National Academy of Administration, Moussourie, ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের কৃত্যকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। সাংগঠনিক কৌশল শিক্ষায় হায়দ্রাবাদের Administrative Staff উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। আবার আমাদের সরকারী কর্মচারীর প্রশিক্ষণের জন্য অর্থাৎ অন্তর্বর্তী প্রশিক্ষণ (Mid-career Training), উত্তর-প্রবেশ প্রশিক্ষণ (In Service Training)-এর জন্য Indian Institute of Public Administration উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কর্মচারী প্রশিক্ষণ বিষয়ে ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের (১৯৬৬-৭০) কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ আছে। এই কমিশনের মতানুসারে ক্যাবিনেট সচিবের তদারকিতে সচিবের নেতৃত্বে একটি কর্মচারী বিভাগ গঠন করা প্রয়োজন যার মূল উদ্দেশ্য হবে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং মানবিক শক্তির বিকাশ-এ সাহায্য করা (Manpower Development)। তবে এই কমিশনের মতে প্রশিক্ষণের বিষয়ে একটা জাতীয় নীতি থাকা যেমন প্রয়োজন, প্রশিক্ষণের সঠিক নিয়ম-নীতি এবং ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন।

৮০-র দশকের শেষভাগ থেকে ভারত সরকার উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার প্রচলন করার উদ্দেশ্যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তবে সরকারী কর্মচারীর প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষা এবং চাকুরীর প্রতি দায়িত্বশীল শেখানোও প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। কাজেই প্রশাসনিক কর্মচারীর প্রশিক্ষণ তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন তিনি সক্রিয়ভাবে দায়িত্বভার গ্রহণে উদ্যোগী হবেন। রাজনৈতিক সচেতনতার শিক্ষা করবেন এবং মানসিক শুদ্ধতা অবলম্বন করবেন। একজন সৎ সাহসী এবং বুদ্ধিমান প্রশাসকের

ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ তার কাজে পরিপূর্ণতা আনতে সাহায্য করে। এবং সুশৃঙ্খলভাবে নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। তিনি একজন সুনিপুণ কর্মী হিসেবেই পরিচিত হন না, তার সততা এবং কর্মক্ষমতার জন্য তিনি সকলের কাছে ব্যক্তিত্বপূর্ণ কর্মচারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারের ভূমিকা এখন ব্যবসায়ী সংস্থার ন্যায় একদিকে যেমন জনকল্যাণমূলক কাজের দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি লাভজনক ব্যবসায়ী সংস্থার ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। এ ধরনের ক্রমবর্ধমান সরকারী কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব যে সকল প্রশাসনিক কর্মীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল কর্মীবৃন্দের প্রকৃত প্রশিক্ষণ সরকারী কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছে। তাই, কর্মী নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রকৃত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নানা চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই সরকারী কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা ছিল তা দূর করা সম্ভব হবে এবং সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রচলন করা যাবে।

৩.৩ (খ) সারাংশ

বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায়ও প্রচলিত ছিল। এবং সাধারণত ব্রিটিশ পদ্ধতির ভারতীয়করণের মাধ্যমেই একটি সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উপস্থাপনা করা হয়েছে। এই এককে উক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৪ (খ) অনুশীলনী

(১) প্রশিক্ষণের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করুন।

(২) ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ বলতে আপনার ধারণা কি ? আপনি কি মনে করেন যে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের প্রশিক্ষণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

(৩) আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রশাসনের পার্থক্য নির্ধারণ করুন।

৩.৫ (খ) গ্রন্থপঞ্জী

1. Torpey W. G. P — *Public Personal Management.*
2. Avasthi and Maheswari — *Public Administration.*
3. *Report of the Committee of Training of Civil Servant* — London.
4. Nigro Felix — *Public Reading and Documents.*

একক ৪ □ মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্পর্ক

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্পর্ক

৪.২.১ মন্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

৪.৩ সারাংশ

৪.৪ অনুশীলনী

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

প্রশাসনিক পরিকাঠামো সর্বাঙ্গসুন্দর হয় যুগ্মভাবে মন্ত্রীপরিষদের এবং রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রয়াসে। ভারতীয় প্রশাসনিক সংস্থার এই দুই শাখার প্রকৃত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করাই উক্ত এককের উদ্দেশ্য।

৪.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা রাজনৈতিক শাসক প্রধানের সঙ্গে প্রশাসনবিদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলাম। এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে, এই দুটি সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা প্রশাসনিক পরিকাঠামোটির মূল উদ্দেশ্য নির্দেশ করলাম। এই এককটি পাঠ করলে অবশ্যই ভারতীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামোটির প্রক্রিয়াশীলতার পেছনে মন্ত্রীপরিষদ এবং কৃত্যকগণের অবদান সম্পর্কে অবগত হবেন।

৪.২ মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্পর্ক

সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে একথা অবশ্যই মনে হবে যে, মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্পর্কে অনেকটা "উদ্দেশ্যের" সঙ্গে "লক্ষ্যের" সম্পর্কের ন্যায় (ends and means)। নীতিগত দিক থেকে সনাতনবাদীগণ মনে করেন যে, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ রাজনৈতিক নীতির ওপর নির্ভর করে

সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাজেই প্রশাসকের দায়িত্ব হল একজন রাজনীতিবিদের দ্বারা নির্ধারিত নীতির সার্থকরূপ প্রদান করা। প্রশাসন বিজ্ঞান শিক্ষার শুরু থেকেই সনাতনপন্থীগণ মন্ত্রীর সঙ্গে প্রশাসকের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে আসছেন। তাদের মতে এই সম্পর্ক একজন রাজনীতিবিদ্-এর সাথে একজন নিরপেক্ষ প্রশাসকের সম্পর্কের সমতুল্য। একজন রাজনীতিবিদ্ দলীয় নীতির ওপর নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একজন নিরপেক্ষ আমলা সেই সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করেন। অর্থাৎ মন্ত্রীপরিষদ নীতি নির্ধারণ করেন এবং রাষ্ট্রকৃত্যকগণ এই নীতি কার্যে রূপায়িত করেন। কাজেই সনাতনপন্থীদের মতে রাজনীতি এবং প্রশাসন দুটি পৃথক, স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন শাস্ত্র।

অন্যদিকে আচরণবাদীগণের এবং সাইমনের মতে রাজনীতি এবং প্রশাসনের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য বা বিভাজন নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক চিন্তাধারার পূর্ণ বিকাশ যেমন সম্ভব, মন্ত্রীপরিষদ এবং প্রশাসকগণের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব। কাজেই এই দুটি সংস্থার পূর্ণ সম্মিলন ছাড়া সরকারী কার্যভার সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অনেক প্রশাসনবিদ্গণ আবার এই দুটি সংস্থাকে দুটি সমান্তরাল সরলরেখা বলে বর্ণনা করেন। তাদের মতে প্রশাসন এবং রাজনীতি প্রশাসন বিজ্ঞানের দুটি পৃথক সংস্থা। কাজেই উভয়ের মিলন যেখানে সম্ভব নয় সেখানে এই সংস্থা দুটির সম্মিলনে কোন সুষ্ঠু সিদ্ধান্তও গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। যে সকল প্রশাসনবিদ এই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন তারা অবশ্যই মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রকৃত্যকের দায়িত্বভার সম্পর্কে বিশেষ অবগত নন। এ বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে, দুটি সংস্থাই একটি বিশাল কর্মকাণ্ডের দুটি ভাগীদার। কাজেই যে দুটি সরলরেখার মাধ্যমে তাদের দায়িত্বভার দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে তা অবশ্যই প্রকৃতি বহির্ভূত। প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার সুবিধার জন্যই এই কাল্পনিক রেখা দুটি টানা হয়েছে। উভয় সংস্থার কার্যাবলী বিভাজনের প্রধান কারণ, সরকারী দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠু এবং সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে পরিচালনা করতে গেলে উভয় সংস্থাকেই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হয়। দায়িত্বভার বিভাজন করার পেছনে উদ্দেশ্য হল প্রতিটি সংস্থাকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। এবং সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক নীতি নির্ধারণের দ্বারা প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পন্ন করা।

সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ মূলত দীর্ঘমেয়াদী হয়। ফলে উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করা এবং নির্ধারিত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা, এই দুটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় সেই সময়ের মধ্যে সরকারী ক্ষমতার পরিবর্তনের অবকাশ থেকেই যায়। ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি সরকারী নীতি পরিবর্তিত হয় তবে অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি কেবল অসমাপ্তই থাকবে না, এই অসমাপ্ত কাজের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ও হবে অগুণতি। কাজেই এই সকল প্রশাসনিক অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যেই রাজনীতিবিদ্গণের অধীনে বিভাগীয় সচিবগণকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রধানের পরিবর্তন ঘটলেও স্থায়ী কর্মচারীগণ অসমাপ্ত কার্যাবলী সমাপ্ত করতে সক্ষম হন এবং তার প্রশাসনিক জ্ঞানের

সাহায্যে তিনি পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং অসমাপ্ত প্রশাসনিক কাজগুলিকে সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। কাজেই উন্নয়নমূলক প্রস্তাব উত্থাপিত করা এবং আইনসভার সমর্থন গ্রহণ করা, একজন বিভাগীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব হলেও কার্যক্ষেত্রে সেই নীতি প্রবর্তনের দায়িত্ব একজন স্থায়ী কর্মচারীর। কাজেই কোন উন্নয়নমূলক নীতি রাজনীতিবিদের ক্ষণস্থায়ী সিদ্ধান্তের দ্বারা পরিচালিত হয় না। একজন সচিবের কর্মদক্ষতার দ্বারা পূর্ণতা অর্জন করে। ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একজন রাষ্ট্রকৃত্যকের ভূমিকা রাষ্ট্রমন্ত্রী অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়।

ভারতবর্ষে মন্ত্রীগণের সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকগণের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একজন মন্ত্রী একজন পেশাগত রাজনীতিবিদের ভূমিকা গ্রহণ করেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি প্রশাসনিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি একজন সচিবের বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার দ্বারা পরিচালিত। কাজেই রাজনীতিবিদ্ হিসাবে একজন মন্ত্রীর প্রশাসনিক অক্ষমতা দূর করার দায়িত্ব একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশাসকের হাতে ন্যস্ত। তিনি কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সাহায্য করেন না, সেই সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষিত আমলা বিভাগীয় মন্ত্রীর অধীনস্ত কর্মচারী মাত্র। বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে একজন প্রশাসক নীতি নির্ধারক এবং নীতি প্রবর্তকও বটে, কিন্তু সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণের সকল প্রশংসা একজন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরই প্রাপ্য। পর্দার আড়াল থেকে একজন প্রশাসক কেবলমাত্র অধস্তন কর্মচারীর ভূমিকাই পালন করেন। জন উন্নয়নমূলক নীতি নির্ধারণের জন্য কোনরূপ প্রশংসার অধিকার তিনি দাবী করতে পারেন না।

রাজনৈতিক দল সদস্য হিসেবে বিভাগীয় মন্ত্রী সরকারী দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জননেতা হিসাবেও পরিচিত হন। তিনি বিভিন্ন সভাসমিতিতে উপস্থিত থেকে এই সকল সভাসমিতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি সভা অলঙ্কৃত করেন এবং সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু তার এই জনপ্রিয় বক্তৃতা রচনা করার দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট সচিবের। কাজেই গণতান্ত্রিক দেশে একজন মন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একজন সচিবের দায়িত্ব বেড়ে যায়। এ সকল ক্ষেত্রে একজন রাষ্ট্রকৃত্যক একাধারে অধস্তন কর্মচারী, বক্তৃতা লেখক, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রশাসক, সমাজ উন্নয়নমূলক নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেন।

কাজেই বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে একজন অধস্তন কর্মীকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় মন্ত্রীর সকল কাজের প্রতি নজর রাখতে হবে এবং একজন কর্মপরায়ণ সচিব হিসাবে তিনি মন্ত্রী মহাশয়ের পার্শ্বছায়ার ন্যায় বিচরণ করবেন।

একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিভাগীয় প্রধান হিসাবে একজন রাজনীতিবিদ্ সকলক্ষেত্রেই অধস্তন কর্মচারীর ওপর নির্ভরশীল নন। একজন উৎসাহী মন্ত্রী অল্প সময়েই প্রশাসনিক কাজে পারদর্শী হয়ে ওঠেন, এবং প্রয়োজনে উন্নয়নমূলক নীতি নির্ধারণ করেন। তিনি নির্ধারিত নীতি প্রণয়নের নির্দেশ

দেন এবং নির্ধারিত নীতি সম্পর্কে সচিবগণের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি অধস্তন কর্মচারীর নিকট প্রয়োজনীয় পরামর্শ চান। অধস্তন কর্মচারীও মন্ত্রী মহোদয়-এর নির্দেশ মেনে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন।

তবে মন্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত প্রণয়নের কোনরূপ জটিলতার সৃষ্টি হলে, উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং তথ্য প্রয়োগ করে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে নীতিগতভাবে সাহায্য করা ইত্যাদি অধস্তন কর্মচারী হিসাবে বিভাগীয় কর্মীগণের দায়িত্ব। ১৯৭০ সালে কোলকাতা নগর উন্নয়নমন্ত্রী, কোলকাতা নগর উন্নয়ন সংস্থা (Kolkata Metropolitan Development Authority) নামে একটি উন্নয়নমূলক সংস্থা গঠন করেন এবং কোলকাতা শহরের বস্তী উন্নয়নের দায়িত্ব উক্ত সংস্থার হাতে প্রদান করেন। কিন্তু সংস্থাটি গঠন করার পেছনে যে সকল প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করার জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবকে নির্দেশ দেন। এই সংস্থা সম্পর্কে কোন রকমের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি উপস্থাপিত করে সরকারী সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রয়োজনীয় যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন।

প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রী হিসাবে একজন রাজনীতিবিদের চিন্তাধারা এবং প্রশাসনিক যুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং অধস্তন সচিবের যুগ্ম উদ্যোগ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগান দেওয়া, সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলিকে সুচারুরূপে উপস্থাপিত করা এবং উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন মন্তব্য প্রদান করা প্রভৃতি দায়িত্ব অধস্তন সচিবগণের ওপর যেমন ন্যস্ত করা হয়েছে তেমনি মন্ত্রীগণের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট সচিবের মনোভাব জেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে সচিবগণের মনে রাখা প্রয়োজন যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনরূপ নাশকতামূলক মন্তব্য তারা করবেন না, এবং নিরপেক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করবেন।

রাজনৈতিক দল সদস্য হিসাবে, বিভাগীয় মন্ত্রীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তার প্রশাসনিক কার্যাবলীর ওপর নির্ভরশীল। কাজেই বিভাগীয় মন্ত্রীগণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে জনগণের মনোভাব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। যেহেতু মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন সেইহেতু কোন সিদ্ধান্তের ফলাফল সম্পর্কে একজন মন্ত্রী সকল সময়ই সচেতন থাকবেন। এক্ষেত্রে তিনি অধস্তন কর্মীর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেন। সংশ্লিষ্ট সচিবের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তাভাবনা করতে পরামর্শ দেবেন, সিদ্ধান্তের পক্ষে জোরালো বক্তব্যগুলি উপস্থাপিত করে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হবেন। Herbert Morrison-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা যায় যে, "শুরু থেকেই বিভাগীয় মন্ত্রীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হবেন। তাকে মনে রাখতে হবে যে, ভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেন কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়।"

বিভাগীয় মন্ত্রীগণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন যত্নবান হবেন তেমনি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও দৃঢ়তার পরিচয় দেবেন। একজন দৃঢ়চেতা মন্ত্রী অতি সহজেই সংশ্লিষ্ট সচিবের শ্রদ্ধার ব্যক্তি হতে পারেন এবং উভয়ের যুগ্ম প্রয়াসে জন উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

অনেকসময় আবার সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার অভাবে মন্ত্রীগণ সচিবগণের হাতের পুতুল হয়ে ওঠেন। কারণ, ব্যক্তি হিসাবে সকল কর্মীই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণের দৃঢ় এবং সুশৃঙ্খল মনোভাব প্রশাসনিক সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। Herbert Morrison-এর মতে মন্ত্রীগণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীগণের মতামত মনোযোগের সঙ্গে শুনবেন, তিনি কর্মীগণকে মতামত প্রদানে উৎসাহী করবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামতের ওপরই গুরুত্ব দেবেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রশাসকগণ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিভাগীয় প্রধানের স্বপ্ন দেখেন যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের বিচারের ওপর আস্থাবান। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্তের গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন থাকেন।

৪.২.১ মন্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বিভাগীয় মন্ত্রীগণ প্রয়োজনে সুবোধ ছাত্রের ভূমিকা পালন করেন এবং বিভাগীয় কার্যাবলী অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেন। তিনি বিভাগীয় দায়িত্ব গ্রহণের কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়াস রাখেন। চরিত্রের দৃঢ়তাই তাকে প্রকৃত সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কার্যভার পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি সুভাষী এবং জনগণের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সচেতন থাকেন। তিনি "নির্দেশ দিতে পারেন, ভয় দেখাতে পারেন, আবার সহানুভূতি দেখাতেও সক্ষম।"

একজন রাজনৈতিক ক্ষমতাবিদের চরিত্রের দৃঢ়তা, যোগসূত্র স্থাপনে অনীহা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনঢ় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সরকারী কার্যভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পরিপন্থী, কাজেই কোন মন্ত্রীর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেন প্রকট হয়ে না ওঠে। তিনি যেন মনোযোগের সঙ্গে সকল কৃত্যকের বক্তব্যগুলি শোনেন, কৃত্যকগণের প্রতি আস্থাশীল হন এবং বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কৃত্যকের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করেন। কর্মীগণের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আলোচনা বা উৎসাহপূর্ণ প্রস্তাবগুলি তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলবেন। তিনি সচিবগণের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করবেন। জটিল সমস্যাগুলিকে নির্ধারিত কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করবেন। নির্ধারিত কমিটির সিদ্ধান্ত পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই সুচারু পদ্ধতি সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রথম প্রণয়ন করেন।

বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সচিবের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে অনেকেই এই মত প্রকাশ করেন যে, মন্ত্রীগণের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত সচিবের বোঝাপড়া সুন্দর এবং সুনিপুণ হলে প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। উভয়ের মধ্যে সুস্থ এবং সাবলীল সম্পর্ক প্রশাসককে দায়িত্বভার সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। তবে সরকারী সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে বিভাগীয় প্রশাসকগণকে সকল রকম গুণের অধিকারী হতে হয়। তিনি সরকারী সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। মানবিক দিক দিয়ে রাজনৈতিক শাসক প্রশাসনিক সচিবের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন। তিনি নির্ভীকভাবে মন্ত্রীর নিকট তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবেন। বিভাগীয় সচিব এই কথা ভেবে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন যে, তার মতামত সরকারের বিবেচনাধীন হয়েছিল।

মন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সচিবের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা এবং বোঝাপড়ার ওপর গড়ে ওঠে অর্থাৎ দুজনের মধ্যে নৈকট্য, বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব ব্যক্তিগত এবং মানসিক সম্পর্ক বিভাগীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

তবে এই ধরনের আদর্শ সম্পর্ক গড়ে তোলা উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর। এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে গেলে উভয়পক্ষকেই নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে যেতে হবে। উভয়ের লক্ষ্য এবং আদর্শের মধ্যে সমতা গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক মন্ত্রীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় নীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং দলীয় নীতির ওপর নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আধুনিক মন্ত্রীগণ আমলাগণের মতামত অগ্রাহ্য করে দৃঢ়তার সঙ্গে সচিবগণের ওপর দলীয় নীতি চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। তবে একজন সুবিবেচক সচিব রাষ্ট্রকৃত্যক হিসাবে খোলাখুলিভাবে মন্ত্রীগণের নির্ধারিত নীতির বিরোধিতা করেন না বটে কিন্তু ধীরে ধীরে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে মন্ত্রীগণের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

আধুনিক মন্ত্রীগণ প্রায়শই, নিজস্ব গণ্ডীর ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, সকল প্রকার সরকারী কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে প্রশাসকের স্বাধীনতা এবং কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়। এই ধরনের হস্তক্ষেপের ফলে একজন সচিব সরকারী কার্যভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন না। ফলে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ব্যাহত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে একজন প্রশাসকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রয়োজনে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে তার সিদ্ধান্তের ত্রুটিগুলি জানাতে পারেন, এবং মন্ত্রীগণকে উন্নয়নমূলক বিষয়ে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করতে পারেন। উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনেই রাষ্ট্রকৃত্যকগণকে কতগুলি সাংবিধানিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কাজেই একজন প্রশাসক, নিজের কর্মদক্ষতা এবং সচেতনতার সাহায্যে খুব সহজেই মন্ত্রীগণকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণে মন্ত্রীগণের সামিল হতে পারেন।

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একজন প্রশাসক কখনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর বিরূপ মন্তব্য করা সমীচীন বলে মনে করেন না, ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশ করেন না। আজ দৃঢ় পরামর্শ প্রদানকারী প্রশাসকের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। প্রশাসকগণের চারিত্রিক দুর্বলতার ফলে বিভাগীয় মন্ত্রীগণের সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বেশি পড়ে। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রী-আমলা সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রশাসকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত এ. ডি. গোরওয়ালা মন্তব্য করেন যে, প্রাক-স্বাধীন ভারতবর্ষে, খোলাখুলিভাবে মতামত প্রকাশের জন্য কোন রাষ্ট্রকৃত্যকের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত না। প্রয়োজনে কোন প্রশাসক অধস্তন কর্মচারীর বদলির বিপক্ষে লিখিত মতামত প্রকাশ করতেন এবং এ বিষয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করতেন, তার সম্মতিসূচক মন্তব্য আদায় করতেন. কিন্তু এর ফলে বিভাগীয় মন্ত্রীদের মনে বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠত না। তারা পূর্ণ সহযোগী মনোভাব নিয়েই সচিবগণের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতেন। মন্ত্রীগণের উদারতা প্রশাসকগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিরপেক্ষতা এবং নির্ভীক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করত।

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে, সম্মিলিত সরকার গঠিত হওয়ার (Coalition Government) পর থেকে মন্ত্রীগণের মধ্যেও দুর্বল মানসিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তারা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভয়ে সচিবগণকে তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেন। ফলে বহুক্ষেত্রেই সচিবগণের ক্ষমতার বিস্তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং স্থানবিশেষে একজন সচিব প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণকে প্রভাবিত করেন। সচিবগণের পরিচালনায় গৃহীত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত মন্ত্রীগণ মেনে নিতে বাধ্য হন। ফলস্বরূপ এই ধরনের সিদ্ধান্ত সুস্থ প্রশাসন পরিচালনার পরিপন্থী হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বলে এই ধরনের প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং একটি সুষ্ঠু সুনির্বন্ধ প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। অনেক সময় এ বিষয়েও প্রশ্ন আসে যে, প্রশাসনিক স্বাচ্ছন্দের প্রয়োজনে একজন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সচিবের পরিবর্তন দাবী করতে পারেন কি না ? এক্ষেত্রে বলা যায় যে একজন মন্ত্রী ক্ষমতাবলে তার অধীনস্থ সচিবের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন বটে কিন্তু যেহেতু তিনি সচিবগণকে নিযুক্ত করেন না তাকে অপসারণ করার ক্ষমতাও তার নেই। তবে প্রয়োজনে তিনি সচিবগণকে পরিবর্তনের দাবী তুলতে পারেন এবং পছন্দ অনুসারে সচিব গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন। যেমন ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে গৃহমন্ত্রী গুলজারি লাল নন্দ, তাঁর অধীনস্থ সচিবের পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করেন। প্রধানমন্ত্রী ওই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী কখনই মন্ত্রীগণের এই ধরনের ইচ্ছার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেন না। তবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, মন্ত্রীদের পছন্দ অনুসারে সচিব পরিবর্তন করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ, সচিব পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে বিভাগীয় বিষয় এবং এসকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ক্যাবিনেটের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ নিয়োজন

সংস্থার (Special Appointment Committee) ওপর আরোপ করা হয়েছে। তবে মন্ত্রীগণের ইচ্ছার মর্যাদা দেওয়া হবে না তা কখনই বলা হয়নি। অন্যদিকে মন্ত্রীগণের বক্তব্য হল যে, মন্ত্রীপরিষদ যেহেতু তার কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়ী থাকেন, সেহেতু তিনি তাঁর দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে একজন কর্তব্যপরায়ণ সচিবের সাহচর্য দাবী করতে পারেন। কারণ, সরকারী কর্মচারীর সাহায্য না পেলে তিনি প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে অক্ষম। তবে ৯০-এর দশকে প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের সৃষ্টি হয়। আধুনিক রাষ্ট্রকৃত্যকগণ বৃত্তিগত ক্ষমতার প্রয়োগে বিশ্বাসী নন। তারা এখন বিভাগীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজী নন। তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ত্রুটিগুলি নির্দেশ করতে অনিচ্ছুক। 'মহেশ্বরী'র ভাষায়— আধুনিক যুগে আমলাগণ চাকুরিতে উন্নতির আশায় অথবা মন্ত্রীগণের কোপ দৃষ্টিতে পড়ার ভয়ে কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে স্থানান্তরিত হওয়ার ভয়ে একজন স্থায়ী কর্মচারীর ক্ষমতা এবং পদমর্যাদা বজায় রাখতে তারা আজ রাজনীতিবিদের হাতের পুত্তলিকা মাত্র। বিভিন্ন সময়ে গঠিত রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় স্তরে কমিটি বা কমিশনগুলি স্থায়ী কর্মচারীর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, রাষ্ট্রকৃত্যকগণ আজ গোত্র বা কুলহীন মানবজাতিতে পরিণত হয়েছেন। তারা আজ প্রলোভন এবং রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। এই ধরনের আদর্শহীনতা এবং রাজনৈতিক নীতির কাছে মাথা নীচু করার মনোভাব, উন্নয়নমূলক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে মন্ত্রীগণও আজ রাজনৈতিক চাপের শিকার। স্বজনপোষণ, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় অনেক সময়। ফলে তারা জনগণ বা আমলাগণের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখতে অক্ষম। নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়াসে তারা জনগণের সাথে মেলামেশা করতে পারেন না। ফলে জনগণের সাথে তাদের সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। এই সম্পর্ক প্রশাসনিক দুর্বলতার সৃষ্টি করে।

১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে সান্তারাম* কমিটি মন্তব্য করেন যে, "সকলের মধ্যেই একটি দৃঢ়বদ্ধ ধারণা আছে, মন্ত্রীগণের সততা এবং দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ইদানীংকালে ভারত সরকারকে বিভিন্ন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যে সকল মন্ত্রীগণ গত কয়েক দশক ধরে নিজেদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশাসনিক কার্যভার পরিচালনা করছেন, তাদের ছেলেমেয়েদের চাকরির জন্য দুর্নীতি অবলম্বন করছেন। তারা নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবছেন না। এই সকল মন্ত্রী এবং সেক্রেটারির সম্পর্কে ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে গঠিত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, আধুনিক যুগে এমন মন্ত্রীর সংখ্যা খুবই কম, যারা সচিবের নিরপেক্ষ পরামর্শকে স্বাগত জানিয়ে থাকেন।

---

* Santaram Commission Report — 1964.

যখন মন্ত্রী নিজের মতকে সর্বসময় ঠিক ভাবেন, এবং আমলাদের মত প্রকাশে বাধা দেন, তখন দুজনেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। সচিবগণ মন্ত্রীর দ্বারা চালিত পুত্তলিকায় পরিণত হন আর মন্ত্রীরা সুচিন্তিত আলোচনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাজনীতি এবং যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর আলোচনা দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৪.৩ সারাংশ

ভারতবর্ষে মন্ত্রীগণের সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একজন মন্ত্রী একজন রাজনৈতিক নেতা নন তিনি বিভাগীয় প্রধান। কাজেই জনগণের উন্নয়নের দিকে নজর রেখে নীতি নির্ধারণ করা এবং সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই একজন জনদরদী মন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে একজন রাষ্ট্রকৃত্যক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করেন। কাজেই মন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকৃত্যকের সুষ্ঠু সম্পর্কই প্রশাসনিক সংস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। উক্ত এককে মন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সম্পর্ক কি হওয়া উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪.৪ অনুশীলনী

(১) মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে রাষ্ট্রকৃত্যকের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(২) আপনি কি মনে করেন, যে রাষ্ট্রকৃত্যক এবং মন্ত্রীগণের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রশাসনকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলতে পারে ?

(৩) রাষ্ট্রকৃত্যকগণ মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য না নিয়ে কি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম ?

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

1. Peter Self — *Public Administration.*
2. Mohit Bhattacharya — *Public Administration.*
3. M. P. Sharma — *Public Administration.*

একক ১ □ কেন্দ্রীয় সরকারের সাংগঠনিক কাঠামো

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

১.৩ ভারতের প্রশাসনের গঠন, প্রকৃতি ও মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১.৪ সারাংশ

১.৫ প্রশ্নমালা

১.৬ উত্তর সংকেত

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে —

- ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও সংসদীয় গণতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে;
- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা যাবে;
- ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদের গঠন, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করা যাবে;
- ক্যাবিনেটের পরিচিতি, দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জানা যাবে।

১.১ প্রস্তাবনা

ভারতে জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বার্থে একটি সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর উপযোগিতা অনুভূত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বিভাগীয় দপ্তর, পরিষদ, বোর্ড, কমিশন, কমিটি প্রভৃতির মাধ্যমে উন্নয়নশীল প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। যদিও ওয়েবারিও আমলাতন্ত্রের প্রভাব অতিক্রম করে রিগসের 'sala' মডেল সর্বতভাবে গ্রহণীয় করে তোলা যায় নি, তথাপি সমাজকল্যাণের নানা স্তরে রাষ্ট্রের ভূমিকাবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশাসনিক কাঠামোয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে।

এই এককে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.২ ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারি ভারতবর্ষের সংবিধান কার্যকর হয়। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় ভারতের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গণপরিষদ ভারতবর্ষের জনগনকে এই অনবদ্য সংবিধান উপহার দেয়। ভারতের সংবিধান প্রধানত ব্রিটিশ সংবিধানের অনুসরণে তৈরি, তবে যেহেতু বহুক্ষেত্রে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ও পরিবেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ, সেহেতু মার্কিন সংবিধানকেও কিয়দংশে অনুসরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতবর্ষে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান এর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। বহুজাতিক এই রাষ্ট্রের আয়তন যথেষ্ট বেশী। একই পরিস্থিতিতে বিরাজমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই সফলভাবে গ্রহণ করেছে, অতঃপর ভারতবর্ষও যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলাকেই সুবিধাজনক মনে করে। পক্ষান্তরে বৃটেনের মত সংসদীয় গণতন্ত্র তাকে অনুপ্রাণিত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় ১৩টি পৃথক পূর্বতন ব্রিটিশ উপনিবেশকে সংযুক্ত করে, অপরপক্ষে ভারতবর্ষ মূলত একটি এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। উপরন্তু, ভারতের সামনে তখন ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গ ও মুসলিম সমাজের সঙ্গে সমঝোতার প্রশ্ন। অতঃপর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও দেশীয় রাজন্যবর্গ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও ক্ষমতা আস্বাদনের অভীপ্সাকে চরিতার্থ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকেই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে মনে করে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না দেখা দেয়, তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীকরণ-প্রবণতাকে অধিক সমাদর করা হয়। এই কারণে একে 'আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' বা 'কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য সহ একটি এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা' বলে পরবর্তীকালে সমালোচনা করা হয়েছে।

যেহেতু ভারতবর্ষ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়, অতঃপর ওয়েষ্টমিনিষ্টার মডেল অনুকরণে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করলেও নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হাতেই আনুষ্ঠানিক শাসনভার অর্পণ করে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ভারতে স্বীকৃত হয়েছে। পার্লামেন্টে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তার সদস্যরা সরকার গঠন করে। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা একক ও যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকে। যে কোনও আইন ও ক্যাবিনেটের যে কোন সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ। প্রশ্নোত্তর পর্ব, দৃষ্টিআকর্ষণ পর্ব, মুলতুবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতির মাধ্যমে পার্লামেন্ট মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১.৩ ভারতীয় প্রশাসনের গঠনপ্রকৃতি ও মুখ্য বৈশিষ্ট্য

প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের সর্বোচ্চ স্তরে আছে ক্যাবিনেট। সরকারী নীতি নির্ধারণ, বিভাগীয় সমন্বয় সাধন, নীতি কার্যকর করা, তদারকি, তথা সমস্ত প্রশাসনযন্ত্রের সুষ্ঠ কর্ম সম্পাদনকে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। তিনটি স্তরে মন্ত্রীপরিষদের বিন্যাস। সর্বনিম্ন স্তরে আছেন উপমন্ত্রীগণ, মধ্যবর্তী স্তরে বিরাজমান রাষ্ট্রমন্ত্রীরা ও সর্বোচ্চ স্তরে আছেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ। বিভিন্ন মন্ত্রকের স্বতন্ত্র দায়িত্বও যেমন ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত,

সমগ্র শাসনবিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্বও তাদেরই ওপর বর্তায়। সাবেকী দায়দায়িত্ব ছাড়াও নানান কারণে বর্তমানে ক্যাবিনেটের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, উদাহরণ হিসাবে অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইনের কথা বলা যায়। Infact, the Cabinet is the real directing and controlling instrument of government, both in administration and in legislation, although it is a body which finds no mention in the Constitution. এহেন গুরুদায়িত্ব বহনকারী ক্যাবিনেটকে শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের নেতা ও প্রকৃত শাসক হ'লেও সমমর্যাদা সম্পন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হিসাবে সমঝোতার মাধ্যমে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

সংবিধানের ৭৪নং ধারায় মন্ত্রীপরিষদের উল্লেখ আছে। সমগ্র মন্ত্রীপরিষদকে নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। উক্ত ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সহ তাঁর মন্ত্রীপরিষদ রাষ্ট্রপতিকে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নির্বাহে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করেন। ৪২তম (১৯৭৬) ও ৪৪তম (১৯৭৮) সংবিধান সংশোধনের পরে রাষ্ট্রপতির নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে উপস্থিতির বিষয়টি আরো সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ এ যাবৎ রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসকের ভূমিকা পালন করতেন। উপরিউক্ত সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানেই একথা স্পষ্ট করে বলা হয়, যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন। পার্লামেন্টপ্রণীত আইন বা মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত একবার তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন। অতঃপর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী পার্লামেন্টে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে এই ক্ষমতা কার্যত অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ভারতে সংগঠিত বিরোধী দল ও সচেতন জনমতের অভাব এই সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সম্মিলিত সরকার বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের যে পরম্পরা বিগত দশকে মৌলিকতায় পরিণত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য বলা যায় যে, মন্ত্রীপরিষদের এই একক কর্তৃত্ব অধিগ্রহণের বিষয়টি সহজসাধ্য নয়।

এইখানে লক্ষণীয় যে ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ প্রথম সারির মন্ত্রী এবং তারা সকলেই মন্ত্রীপরিষদের সদস্য। অন্যদিকে মন্ত্রীপরিষদের (যেমন রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) সকলেই কিন্তু ক্যাবিনেট মন্ত্রী নন বা ক্যাবিনেটের সদস্য নন। সূক্ষ্ম অর্থে ক্যাবিনেট একটি সংস্থা। রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের বাদ দিয়েও প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণের বৈঠক হতে পারে। সাধারণত বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্যাবিনেট বৈঠক হতে পারে।

মন্ত্রীপরিষদ প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব রাষ্ট্রমন্ত্রীদের দেওয়া হলেও উপমন্ত্রীগণ কেবল সাহায্যকারীর ভূমিকায় থাকেন অথবা বিভাগীয় দায়িত্বের একটি অংশের ভার তাদের দেওয়া হয়। সরকারী প্রশাসন পরিচালনার প্রধান দায়িত্বটি পালন করেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই ক্যাবিনেটই যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে। The Cabinet is responsible for the final determination of policies and as well as the over-all direction, coordination and supervision of the business of government and its administrative organisation.

ক্যাবিনেটের মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী অথবা তাঁর মনোনীত কোনও বর্ষীয়ান মন্ত্রীমহোদয়। এই মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন ক্যাবিনেট সচিব, যিনি সমস্ত আলোচ্য বিষয়াদি এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করেন। এহেন গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য এবং জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজনৈতিক বিষয়াদি কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় কমিটি, নিয়োগ কমিটি ইত্যাদি। তিন থেকে আটজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটির সভা পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে, সরকারী কার্য পরিচালনার মুখ্য দায়িত্বটি ক্যাবিনেটেই বহন করে। ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ যেহেতু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অতএব তাদের প্রশাসনিক জটিলতা বা কৌশল ও নিয়মনীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকাই স্বাভাবিক। উপরন্তু গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী মন্ত্রীগণের স্থায়িত্বও অনিশ্চিত। রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাবিনেটের মন্ত্রীগণ সাধারণতঃ রাজনৈতিক পরিচয়ে নিযুক্ত হন না, বরং তাদের অভিজ্ঞতার ও দক্ষতার নিরিখেই অধিকাংশ সময়ে তারা নিযুক্ত হ'ন। গ্রেট বৃটেনে রাজা-রাণী নিয়মতান্ত্রিক শাসক হ'লেও দীর্ঘ স্থায়িত্ব তাঁকে যে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে, তা ক্যাবিনেটের কার্য-পরিচালনার সহায়ক হ'তে পারে। কিন্তু ভারতে এর কোনটাই নেই বলে সরকারী আমলা ও বিশেষজ্ঞদের ওপর ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণের নির্ভরশীলতা অপেক্ষাকৃত বেশী।

প্রধানতঃ যে তিনটি কর্মদপ্তরের সহায়তায় সামগ্রিকভাবে কেন্দীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়, তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, ক্যাবিনেট সচিবালয় ও কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও প্রশাসন যন্ত্রের সুষ্ঠ কার্য নির্বাহকে সুনিশ্চিত করবার জন্য এরা প্রত্যেকেই অপরিহার্য। এছাড়া আছে সঞ্চালক অফিস, যাদের ভূমিকাও যথেষ্ট উল্লেখের দাবী রাখে।

১.৪ সারাংশে

মহাভারতের সময় থেকে শুরু করে ভারতীয় প্রশাসন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করে বলে মনে করা হয়। মৌর্য ও গুপ্তযুগে ভারতীয় প্রশাসনের একটি সুসংহত রূপ লক্ষ্য করা যায় মধ্যযুগেও ভারতীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় সুসংহত বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, ব্রিটিশ অবদানেই ভারতীয় প্রশাসন বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্র ও দায়িত্বশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব ব্রিটিশ শাসনের অনুকরণে কেন্দ্রীভূত ও অখণ্ড-প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন -

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের অদলবদল দেখা যায়। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতভাবে প্রধানমন্ত্রী বিভাগের অদলবদল করেন এবং দায়িত্ব বণ্টন করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও তার সচিবালয়,

অর্থমন্ত্রক

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

শ্রম ও পুনর্বাসন মন্ত্রনালয়

খাদ্য, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রক

শিল্পমন্ত্রক

আইন ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রক

রেলমন্ত্রক

শিক্ষা ও যুবকল্যাণ মন্ত্রক

বার্তা, বেতার ও যোগাযোগ মন্ত্রক

বিদেশমন্ত্রক

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

যোগাযোগ ও পর্যটন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

বৈদেশিক বাণিজ্য, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বিভাগ নিয়ে গঠিত। রাজ্যস্তরে অনুরূপ বিভাগীয় বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় প্রশাসনিক কাঠামোর মূল্যায়ন করা আবশ্যক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অভিনবত্বও ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোকে কিঞ্চিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে। উন্নয়নশীল প্রশাসনের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় প্রশাসন কিভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে, তা অবশ্যই একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য কার্যকর করা, বেসরকারীকরণ, ব্যাঙ্ক ও বীমাতে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করা, অর্থনৈতিক সংস্কারে দ্রুতায়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্রদূরীকরণ প্রভৃতি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ভারতীয় প্রশাসনের কর্মের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে প্রশাসনে রাজনীতিবিদ ও আমলা উভয়ের গুরুত্বই বৃদ্ধি পেয়েছে। জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনকে আরো গতিশীল করার চেষ্টা হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব অস্বীকার না করলেও মূলতঃ কেন্দ্রীকরণকেই অধিক প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কলাকৌশলের ব্যবহার, (Computer), উন্নত সংগঠন ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থা, গবেষণা, কাজের গতিবৃদ্ধি, সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার প্রভৃতি দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। তবে পরিশেষে বলা যায় যে, সার্বিক সাফল্য নির্ভর করছে, দুর্নীতিমুক্ত, উপযুক্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর।

১.৫ প্রশ্নমালা

১) সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন ঃ

ক) ভারত একটি — এককেন্দ্রিক / যুক্তরাষ্ট্রীয় / আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

খ) ভারতের যুক্তরাষ্ট্র — কানাডা / সুইজারল্যাণ্ড / মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলে তৈরী।

গ) মার্কিন / কানাডা / ভারতের যুক্তরাষ্ট্র আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ।

ঘ) ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র বৃটেন / ফ্রান্স-এর অনুসরণে গঠিত।

ঙ) মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় লোকসভা /রাজ্যসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের দ্বারা।

২) একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল গঠন বৈশিষ্ট্য কি?

খ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে 'আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' বলা হয় কেন?

গ) পার্লামেন্ট মন্ত্রীপরিষদকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?

ঘ) মন্ত্রীপরিষদ কয়টি স্তরে বিন্যস্ত?

ঙ) প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা কি?

চ) ক্যাবিনেট মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন কে?

ছ) যে তিনটি কর্মদপ্তরের সহায়তায় কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়, তা উল্লেখ করুন।

৩) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

ক) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গঠন বৈশিষ্ট্য-এর প্রকৃতির ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছে?

খ) ভারতীয় প্রশাসনে ক্যাবিনেটে ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যাহা জানেন লিখুন।

গ) ভারতে অনুসৃত সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করুন।

৪) সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

ক) রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মন্ত্রীপরিষদের সম্পর্ক কি?

খ) ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পার্থক্য কি?

গ) ক্যাবিনেট কমিটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

১.৬ উত্তরসংকেত

১) ক) ভারত একটি আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

খ) ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের আদলে তৈরী।

গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ।

ঘ) ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র বৃটেনের অনুসরণে গঠিত।

ঙ) মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের দ্বারা।

২) ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় ১৩টি পৃথক পূর্বতন ব্রিটিশ উপনিবেশকে সংযুক্ত করে। প্রথমে আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় অবস্থা (confederation) ও ১৭৮৭ সনে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের মাধ্যমে ১৭৮৯ সনে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়।

খ) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না দেখা দেয়, তার জন্য মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীকরণ প্রবণতাকে অধিক সমাদর করা হয়। এই কারণে একে 'আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' বা 'কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যসহ একটি এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা' বলে পরবর্তীকালে সমালোচনা করা হয়েছে। যথাক্রমে কে. সি. হোয়ার ও আইভর জেনিংস এই সমালোচনা করেন।

গ) প্রশ্নোত্তর পর্ব, দৃষ্টি আকর্ষণ পর্ব, মুলতুবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতির মাধ্যমে পার্লামেন্ট মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) তিনটি স্তরে মন্ত্রীপরিষদ বিন্যস্ত। সর্বনিম্নস্তরে আছেন উপমন্ত্রীগণ, মধ্যবর্তী স্তরে বিরাজমান রাষ্ট্রমন্ত্রীরা ও সর্বোচ্চ স্তরে আছেন ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ।

ঙ) প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের নেতা ও প্রকৃত শাসক। তথাপি তিনি সমমর্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হিসাবে সমঝোতার মাধ্যমে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

চ) ক্যাবিনেটের মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী অথবা তাঁর মনোনীত কোনও বর্ষীয়ান মন্ত্রীমহোদয়।

ছ) প্রধানতঃ যে তিনটি কর্মদপ্তরের সহায়তায় সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রিয় প্রশাসন পরিচালিত হয়, তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, ক্যাবিনেট সচিবালয়, ও কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩) ক) উঃ সঃ - ১.২ - প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

খ) উঃ সঃ - ১.৩ - প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অনুচ্ছেদ।

গ) উঃ সঃ - ১.২ প্রথম অনুচ্ছেদ - প্রাসঙ্গিক অংশমাত্র, তৃতীয় অনুচ্ছেদ, চতুর্থ অনুচ্ছেদ।

১.৩ - দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অনুচ্ছেদ।

৪) ক) ১.৩ - দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

খ) ১.৩ - পঞ্চম অনুচ্ছেদ

গ) ১.৩ - চতুর্থ অনুচ্ছেদ

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1) Maheshwari. S. R. *Indian Administration*, (Fifth ed.) New Delhi, Orient Longman, 1995, P.20. New

2. *The Administrative Reform Commission :* Report on the Machinery of the Government of India and its Procedures of Work, 1969, P.4

3. চক্রবর্তী, দেবাশীষ, *গণপ্রশাসন, পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা,* কলিকাতা, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, ১৯৯৯

4. R. K. Arora, R. Goyal, *Indian Public Administration.*

একক ২ □ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর - উৎপত্তি ও উপযোগিতা

২.৩ সংগঠন

২.৪ কার্যাবলী

২.৫ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ভূমিকা ও মুখ্যসচিব

২.৬ সারাংশ

২.৭ প্রশ্নমালা

২.৮ উত্তরসংকেত

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে —

- ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবহারিক স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।
- প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাবৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।
- প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্ভবের প্রেক্ষিত ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাবে।
- প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারনা লাভ করা সম্ভব হবে।
- মুখ্যসচিবের দায়িত্বভার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাবে।

২.১ প্রস্তাবনা

সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী যে রাজনৈতিক দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের সদস্যরা মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে। অতঃপর ভারতবর্ষে সাধারণভাবে প্রতি পাঁচবছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মন্ত্রীপরিষদে মুখ বদলের সম্ভাবনা থেকে যায়। ১৯৮৯ সাল থেকে সম্মিলিত বা সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকারের যে ধারাবাহিক পরিক্রমা শুরু হয়েছে, তার ফলে দীর্ঘস্থায়ী সরকারের ধারণা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনভিজ্ঞতা বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর পদের উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধি যেমন তার কার্যভারকে

জটিল করে তুলেছে, তেমনি আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, বিভিন্ন দপ্তর সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা, জনসম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর দপ্তর তাঁর অন্যতম সহায়কে পরিণত হয়েছে। ব্রজেশ মিশ্রের ভূমিকা প্রশ্ন তুলতেই পারে যে কায়ার (প্রধানমন্ত্রী) থেকে ছায়ার (মুখ্যসচিব) পরিসর বেশি কিনা।

এই কারণে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্ভব, বিকাশ, কাজ, ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এই মুহূর্তে বিশেষভাবে জানা দরকার, যা এই এককে আলোচিত হল।

২.২ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ঃ উৎপত্তি ও উপযোগিতা

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষেও একযোগে নিয়মতান্ত্রিক শাসক ও প্রকৃত প্রশাসকের উপস্থিতি স্বীকৃত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সংবিধান রাষ্ট্রপতির হাতেই ভারতের শাসনভার অর্পন করলেও (৫৩/১ ধারা), প্রকৃত দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ওপর। সংবিধানের ৭৫/১ ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদেরও নিয়োগ করেন। ১৯৭৬ ও ১৯৭৮ সালে যথাক্রমে ৪২তম ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিছক আনুষ্ঠানিক অস্তিত্বকে আরো সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৯ সনের পর থেকে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে। বিশেষতঃ সম্মিলিত সরকার বা সংখ্যালঘু সরকারের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় কোনও একটি রাজনৈতিক দল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করছে না বলে, অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে সকল ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা ও তার ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সময়কালে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও গুরুত্ব একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এই সময়ে একাধারে প্রধানমন্ত্রী নিজেকে স্বীয় দলের অভ্যন্তরে, লোকসভায় ও ক্যাবিনেটে প্রকৃত নেতা হিসাবে প্রযুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই প্রধানমন্ত্রীর কর্মপরিধি ও গুরুত্ব যত বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ততই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুখ্যসচিবের পরিচালনাধীনে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ভূমিকা ও গুরুত্বও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৪৭ সালেই ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে তদানিন্তন গভর্ণর জেনারেল যে সকল দায়িত্ব পালন করতেন, স্বাধীন ভারতে স্বাভাবিক ভাবেই তা সমর্পিত হয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তে। অতঃপর মুখ্য প্রশাসক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী যে প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তার সুষ্ঠ রূপায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে গঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে এই সচিবালয় 'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর' নামে পরিচিত হয়। ভারতীয় সংবিধানে এই দপ্তরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, অর্থাৎ এটি একটি সংবিধান বহির্ভূত সংস্থা হিসাবেই কাজ করতে থাকে। অবশ্য ১৯৬১ সালের 'Government of India Allocation of Business Rules' অনুযায়ী এই দপ্তরকে একটি সরকারী বিভাগের মর্যাদা দেওয়া হয়।

২.৩ সংগঠন

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাংগঠনিক পরিকাঠামো লক্ষ করলে প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যটি পরিস্ফুট হয়, তা হল এই সংস্থাটি ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত, যার সর্বোচ্চ আসনে প্রধানমন্ত্রীর সচিব তথা মুখ্যসচিবের অধিষ্ঠান। এর নিম্নবর্তী স্তরগুলিতে রয়েছেন, যথাক্রমে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব (I), যুগ্ম সচিব (II), যুগ্ম সচিব (III), নির্দেশক (I), নির্দেশক (II), নির্দেশক (III) এবং নির্দেশক (IV)।

শাসনবিভাগের বিশাল কর্মকান্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিভিন্নস্তরে দায়িত্ব বন্টিত হয়েছে, যদিও অন্তিম পর্যায়ে পিরামিডের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত মুখ্যসচিবের নিকট দায়বদ্ধতার বিষয়টিও স্বীকৃত হয়েছে।

মুখ্যসচিব সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ সম্বন্ধে অবহিত থাকেন এবং যে কোন কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। উপরন্তু সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের কার্যাবলীও তার নজরাধীনে থাকে।

অতিরিক্ত সচিব প্রধানতঃ বিভিন্ন মন্ত্রকের কর্মী ও নীতি তথা কার্যবিধি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেন।

যুগ্মসচিব (I) স্বরাষ্ট্র, আইন, বিচার প্রভৃতি, যুগ্মসচিব (II) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রশাসনিক পরিচালন ব্যবস্থা, ভূতল পরিবহন, যোগাযোগ, রেলপথ, পর্যটন প্রভৃতি বিষয়াদি, এবং যুগ্ম সচিব (III) পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, আনবিক শক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলির তত্ত্বাবধান করেন।

নির্দেশক (I) হলেন 'Officer on Special Duty', যিনি প্রধানতঃ গ্রামীন উন্নয়ন ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদানের বিষয়গুলির ওপর লক্ষ রাখেন। নির্দেশক (II) হলেন 'Incharge of Home Affairs' নির্দেশক (III) হলেন 'Odd Job-Man' যার কোনও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব চিহ্নিত নেই, ইনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকারী হিসাবে পরিচিত। নির্দেশক বিভিন্ন রাজ্য সরকারের, বিশেষতঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রশাসনিক বিষয়াদির তত্ত্বাবধানে করেন।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে কাজের এই বণ্টন প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

উপরিউক্ত কর্মসঞ্চালকমন্ডলীর তলায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত বহু কর্মচারী রয়েছেন, যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এই কর্মচারীবৃন্দ অন্যান্য মন্ত্রকের কর্মচারীদের সঙ্গে সমমর্যাদা সম্পন্ন। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক অবস্থানের বাইরে যে বিষয়টি ১৯৮০ এর দশকের শেষ ভাগ থেকে আলোচিত হতে শুরু করেছে, তা হল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্থান পেলে কিছু বিশেষ সুবিধা সহজেই লাভ করা যায়। এই বিশেষ সুবিধাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'Power' তথা ক্ষমতা, 'Perquisites' তথা লাভজনক উপার্জন, 'Patronage' তথা পৃষ্ঠপোষকতা এবং অবশ্যই 'Promotion' তথা পদোন্নতি।

২.৪ কার্যাবলী

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাজের হিসাব করার প্রাক্কালে মনে রাখা আবশ্যক যে কোনও স্বতন্ত্র বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট হয়, এমন সকল কাজের দায়িত্বেই এই দপ্তরের ওপর আরোপিত হতে পারে। প্রথমতঃ প্রশাসনিক কার্যবিধি অনুযায়ী যে সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীকে গ্রহণ করতে হয়, তা পক্ষান্তরে তার দপ্তরের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ মুখ্য প্রশাসক হিসাবে সমস্ত দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়, তার নিজস্ব প্রশাসনিক সাধারণ কর্ম দায়িত্বের বাইরেও বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, বিভিন্ন বিভাগের কাজের প্রগতি সম্বন্ধে খবর রাখা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এই কাজে সক্রিয়ভাবে তাকে সাহায্য করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান ও রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর যোগসূত্র স্থাপনও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অন্যতম কাজ। ভারতবর্ষ মূলতঃ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈশিষ্ট্যগত বিচারে অনেকাংশেই পৃথক। ভারতে রাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ অনেক প্রত্যক্ষ এবং নানাকারণেই কেন্দ্রের ওপর রাজ্যগুলির নির্ভরতা অনেক বেশী। এমতাবস্থায় রাজ্যে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বা রাজ্যে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রগতি সম্বন্ধে অবগত থাকার দায় অনেকাংশেই কেন্দ্র সরকার, তথা প্রকারান্তরে প্রধানমন্ত্রীর ওপর বর্তায়। এই কাজেও তাকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে তাঁর দপ্তর।

চতুর্থতঃ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার রূপায়ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ভারতবর্ষের আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকার তাৎপর্য আরো বেশী। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে বিভিন্ন রাজ্যগুলির বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুষ্ঠু সমাধানকল্পে তার দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমতঃ প্রশাসনিক কার্যবিধি নির্ধারণ ও আশু প্রশাসনিক সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ষষ্ঠতঃ প্রধানমন্ত্রীর তরফে জনসংযোগ রক্ষাকারী হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বিশেষ গুরুত্বের দাবী করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাজের ব্যাপকতা এই নির্দিষ্ট সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা সীমিত করা অসম্ভব বললেই চলে। আনুষ্ঠানিক দায়িত্বের বাইরেও এই দপ্তরের কর্মপরিধি বিস্তৃত। তথ্য অনুসন্ধান, প্রধানমন্ত্রীর তরফে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন, প্রধানমন্ত্রীর জন্য বক্তৃতার বয়ান প্রস্তুত এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সহায়তা করা ইত্যাদিও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দপ্তরকে প্রধানমন্ত্রীর 'think tank' বলে অভিহিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের হাতে এই জাতীয় আনুষাঙ্গিক কাজগুলি অর্পন করার উদ্দেশ্য হ'ল, প্রধানমন্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটে সমন্বয়কারী

হিসাবে ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহীতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে ক্যাবিনেটের কাজকর্মকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রী যদি অবিসম্বাদী নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তাহলে ক্যাবিনেটের কাজে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রভাবও সমান ভাবে বৃদ্ধি পায় বলে অনেকে মনে করেন। পররাষ্ট্র দপ্তর একটি আলাদা মন্ত্রক হিসাবে স্বীকৃত। তথাপি, বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সেই সূত্রে তার দপ্তর স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়েও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

২.৫ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ভূমিকা ও মুখ্যসচিব

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট ভাবেই অনুমান করা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের গুরুত্ব নির্ভর করে, প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব ও কার্যকারিতার ওপর। এযাবৎ লক্ষ্য করা গেছে যে, জওহরলাল নেহেরু এবং জনতা সরকারের সময়কাল ব্যতিরেকে অন্যান্য সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি, অতঃপর তিনি ক্যাবিনেট সচিবালয়ের অধীনে এই দপ্তরকে স্থাপন করেন। নেহেরু একজন ব্যক্তিগত সচিবকে নিয়ে এই দপ্তরের সূচনা করেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী (১৯৬৪-৬৬) প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আমলাদের স্থান দিয়ে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। ধরম বীর (Dharmam Vira), প্রখ্যাত ICS মুখ্যসচিব হিসাবে নেহেরু জমানায় দায়িত্ব পালন করেন। এরপর অর্থনীতিবিদ এল কে ঝা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে অভিষিক্ত হন। শাস্ত্রীর আমলে এল. কে. ঝা এর নেতৃত্বে মুখ্য সচিবের গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে মাইকেল ব্রেচার বলেন যে

"There is ample evidence to indicate that the P.M.'s Secretariat, through the forceful personality of L. K. Jha, has become a major power centre in All India Politics and an interest group in its own right. He [L. K. Jha] has exerted pressure on many issues, notably in the vital spheres of economic policy and foreign affairs." কিন্তু এসত্ত্বেও এল. কে. ঝা প্রথাগত রক্ষণশীলতার গন্ডীর বাইরে এই দপ্তরকে বার করে নিয়ে আসতে পারেন নি। পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন যে, "...though he could see the Prime-Minister's Secretariat being a powerful department of its own with the powers to reach on all sides, he cared not to break the established conventions."2 এই সময়ে দেখা যায় যে, ক্যাবিনেট সচিবালয় থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরকারী কাগজপত্র প্রেরিত হ'ত এবং তা হ'ত প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে তৎকালীন মুখ্যসচিবের অগোচরেই।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও পূর্বতন আধিকারিকরাই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণেও এল. কে. ঝা তাঁর সঙ্গী হন। ১৯৬৭ সালে শ্রীমতী গান্ধী এল. কে. ঝা'কে মস্কো, লন্ডন, প্যারিস, ওয়শিংটন ও বার্লে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (NPT) বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পাঠান।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়েও কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৬৯ সালে ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস পায় ও এরপরেই এল. কে. ঝা এর স্থানে পি. এন. হকসরকে (P. N. Haksar)

নিয়োগ করা হয়। এই নবনিযুক্ত সচিব মহাশয় অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং অত্যন্ত ক্ষমতাবান আমলা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও 'গরীবী হঠাও' প্রকল্পকে জনপ্রিয়তা প্রদান করতে তার সক্রিয় ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

ইতিমধ্যে ১৯৬০ এর দশকের মধ্যভাগে Research and Analysis Wiag (RAW), প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং গোপন অনুসন্ধানকারী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ সালে পি.এন.হকসরের জায়গায় অভিষিক্ত হ'ন Delhi Institute of Economic Growth এর অধ্যাপক শ্রী পি. এন. ধর। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত সমস্ত নীতি গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে। সুতরাং ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে এই সংস্থাটির ভূমিকা ও কলেবর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। এমনকি ১৯৭৫ এর জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় পরিণত হয়, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের হাতেই প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হয়।

জরুরী অবস্থাকালে ক্ষমতা অপব্যবহারের পরিমাপ করার জন পরবর্তীকালে শাহ কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ক্ষমতা লিপ্সাই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। অতঃপর জনতা সরকার ১৯৭৭ সালে প্রথমেই চেষ্টা করে যাতে এই দপ্তরের গুরুত্ব হ্রাস পায় সেই মর্মে ১৯৭৭ এর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের নাম পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর করা হয় এবং এই সংস্থার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকৃত হয়, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর সরকারী কার্য পরিচালনায় সহায়তা করার দায়িত্বই কেবলমাত্র এই সংস্থার হস্তে অর্পিত হয়। জনতা প্রধান মন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই ভি. শংকর'কে মুখ্যসচিব হিসাবে নিয়োগ করেন এবং ভি. শংকর তাঁর ব্যক্তিত্ব বলে এই দপ্তরকে বিশেষমাত্রা প্রদান করেন, অর্থাৎ সরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই দপ্তরের গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পায় নি। বরং ভি শংকর কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীও নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন।

১৯৮০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেন। পুনরায় এই দপ্তরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পি. সি. আলেকজান্ডারকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মুখ্যসচিবের দায়িত্বভার অর্পন করেন। ১৯৮০ সালে শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যে দপ্তরের ভূমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ১৯৮৪ সালে শ্রী রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে ক্রমে তা প্রধান সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থায় পরিণত হয়।

পি. সি. আলেকজান্ডারের পরে এই পদ অলঙ্কৃত করেন, সরলা গ্রেওয়াল, বি. জি. দেশমুখ, এ. এল. ঝা প্রমুখরা, যাদের অধিকাংশই এসেছেন ক্যাবিনেট সচিবালয় থেকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে এই দপ্তর ক্যাবিনেট সচিবালয় অপেক্ষা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দপ্তরের হাতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বেরও কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। বিগত দশ বছরের যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সম্মিলিত সরকারের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করেছে। প্রশাসনিক ধারাবাহিকতার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারও এই ভূমিকা ও গুরুত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর একথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে, "..... one can visualise its continuing ascendancy in the forseeble future"[১])

২.৬ সারাংশ

প্রধানমন্ত্রীকে প্রশাসনিক কার্য নির্বাহে সহায়তা করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। নেহেরুর পরবর্তী সময়ে এই দপ্তরের গুরুত্ব ও কার্যভার ক্রমে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ জ্ঞান, সহযোগিতার মনোভাব, ধৈর্য, আনুগত্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কর্মীদের বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হয়। এই দপ্তরের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। আধিকারিকদের রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়েও অনেক সময়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে এই দপ্তরের কার্যকারিতা ও দায়িত্বশীলতা নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের ওপর।

২.৭ প্রশ্নমালা

১) সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন ঃ

ক) প্রধানমন্ত্রী নিয়মতান্ত্রিক / প্রকৃত শাসক।

খ) প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ১৯৪৭ / ১৯৬৬ / ১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর নামে পরিচিত হয়।

গ) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সর্বোচ্চ আসনে রয়েছেন - মুখ্যসচিব / যুগ্মসচিব / নির্দেশক।

ঘ) ক্যাবিনেট সচিবালয় / কেন্দ্রীয় সচিবালয় / প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে প্রধানমন্ত্রীর 'think tank' বলা হয়।

ঙ) ১৯৮০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী /এল কে ঝা / ভি. শংকর / পি. সি. আলেকজান্ডারকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মুখ্যসচিব পদে নিয়োগ করেন।

২) **একটি / দুটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ**

ক) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সরকারী বিভাগের মর্যাদা পায় কিভাবে?

খ) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের স্তরবিন্যাসটি উল্লেখ কর।

গ) ১৯৬০ এর দশকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা ঘটে?

ঘ) পি. এন. হকসরের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ কর।

ঙ) পি. এন. ধর মুখ্যসচিব পদে কবে, কার স্থলাভিষিক্ত হন?

চ) শাহ কমিশন কেন গঠিত হয়?

৩) **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন (৫০ টি শব্দের মধ্যে)**

ক) শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়কালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে কেন?

খ) ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রভাব কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে?

গ) এল. কে. ঝা'র মুখ্যসচিব থাকাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কার্যকারিতা কিরূপ ছিল?

ঘ) জনতা সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের গুরুত্ব কিরূপ ছিল?

ঙ) সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ভূমিকা কিভাবে ও কেন বৃদ্ধি পেয়েছে?

৪) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

ক) রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় তথা দপ্তরের ভূমিকা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে ব্যাখ্যা করুন।

খ) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোটি বর্ণনা করুন।

গ) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাজ ও ভূমিকা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

ঘ) মুখ্যসচিবের ক্ষমতা ও দায়িত্বের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে যাহা জানেন লিখুন?

২.৮ উত্তর সংকেত

১) ক) প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক।

খ) প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর নামে পরিচিত হয়।

গ) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সর্বোচ্চ আসনে রয়েছেন মুখ্যসচিব।

ঘ) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে প্রধানমন্ত্রীর 'Think Tank' বলা হয়।

ঙ) ১৯৮০ সালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পি. সি. আলেকজান্ডারকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মুখ্যসচিব পদে নিয়োগ করেন।

২) একটি / দুটি বাক্যে উত্তর দিন :

ক) ১৯৬১ সালের 'Government of India Allocation of Business Rules' অনুযায়ী এই দপ্তরকে একটি সরকারী বিভাগের মর্যাদা দেওয়া হয়।

খ) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সর্বোচ্চ আসনে রয়েছেন — প্রধানমন্ত্রীর সচিব তথা মুখ্যসচিব। এর নিম্নবর্তী স্তরগুলিতে রয়েছেন যথাক্রমে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব (I), যুগ্ম সচিব (II), যুগ্ম সচিব (III), নির্দেশক (I), নির্দেশক (II), নির্দেশক (III) এবং নির্দেশক (IV)।

গ) ১৯৬০-এর দশকের মধ্যভাগে Research and Analysis Wing (RAW) প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং গোপন অনুসন্ধানকারী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ) এল. কে. ঝা'র জায়গায় পি. এন. হকসর নিযুক্ত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং অত্যন্ত ক্ষমতাবান আমলা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও "গরিবী হঠাও" প্রকল্পকে জনপ্রিয়তা প্রদান করতে তার সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখের দাবী রাখে।

ঙ) ১৯৭৪ সনে পি. এন. হকসরের জায়গায় অভিষিক্ত হন Delhi Institute of Economic Growth-এর অধ্যাপক শ্রী পি. এন. ধর।

চ) জরুরী অবস্থাকালে ক্ষমতা অপব্যবহার পরিমাপ করার জন্য পরবর্তীকালে শাহ কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ক্ষমতালিপ্সাই এর জন্য মূলতঃ দায়ী।

৩) ক) ২.২ — দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

খ) ২.৪ — শেষ অনুচ্ছেদ

গ) ২.৫ — দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ-এরপর অর্থনীতিবিদ এল. কে. ঝা প্রধানমন্ত্রীর ..... তৎকালীন মুখ্যসচিবের অগোচরেই; তৃতীয় অনুচ্ছেদ।

ঘ) ২.৫ — সপ্তম অনুচ্ছেদ

ঙ) ২.৫ — শেষ অনুচ্ছেদ রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণের ..... in the forseeble future.

৪) ক) ২.২, ২.৫ গ) ২.৪, ২.৫ - নির্বাচিত অংশ

খ) ২.৩ ঘ) ২.৫

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Mallik, Sarla, *The Prime Minister of India : Powers and Functions*, Pallain, Chinta Prakashan, 1984, P.55

২) Maheshwari, Shriram, *Indian Administration* (Fifth ed.), New Delhi, Orient Longman, 1995, P.34

৩) Arora, Ramesh. K., Goyal Rajni, *Indian Public Administration* (2nd ed.), New Delhi, Wishwa Prakashan, 1997, P.112.

৪) Alexander, P. C., *My Years with Indira Gandhi*, Delhi, Vision, 1991

একক ৩ □ ক্যাবিনেট সচিবালয়

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ ক্যাবিনেট সচিবালয়ের উৎপত্তি

৩.৩ ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গঠন

৩.৪ ক্যাবিনেট সচিবালয়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যকরী ভূমিকার মূল্যায়ন

৩.৫ ক্যাবিনেট সচিব

৩.৫.১ মূল্যায়ন

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ প্রশ্নমালা

৩.৮ উত্তর সংকেত

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে —

- প্রাক্‌স্বাধীন ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য যে সাংগঠনিক পরিকাঠামো ব্রিটিশ সরকার গড়ে তোলে তার আভাস পাওয়া যাবে।
- স্বাধীন ভারতবর্ষে অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় হিসাবে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের উদ্ভব, গঠন, কাজ ও ভূমিকা সম্বন্ধে জানা যাবে।
- ক্যাবিনেট সচিবের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।

৩.১ প্রস্তাবনা

ক্যাবিনেট সচিবালয় কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য অন্যতম সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। ব্রিটিশ ভারতে তদানিন্তন ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদের সচিবালয়ের উত্তরসূরী হল স্বাধীন ভারতের ক্যাবিনেট সচিবালয়। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের বহুমুখী কার্যবিলী সম্পন্ন করার কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করে এই সংস্থা। বিশেষ যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ও অধিকর্তাদের নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেট সচিবালয় ক্যাবিনেট তথা সরকারের কার্য পরিচালনায় দক্ষতা আনয়ন করে এবং সঠিকভাবে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন করে।

এই এককে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গঠন, কাজ, ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ক্যাবিনেট সচিবালয়ের মুখ্যপরিচালক তথা মুখ্য সচিবের কাজ ও দায়িত্বের বিশদ বর্ণনা এই এককের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্যাবিনেট সচিবালয় ও মুখ্যসচিবের প্রত্যাশিত ভূমিকা ও বাস্তবের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যের প্রসঙ্গটি এই এককে আলোচিত হয়েছে।

৩.২ ক্যাবিনেট সচিবালয়ের উৎপত্তি

১৯৫০ সালে ভারতবর্ষে যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছে, তার অনেকাংশই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবদান। ১৯১৬ সালে বৃটেনে প্রশাসনের সুবিধার্থে প্রথম ক্যাবিনেট সচিবালয় গঠন করা হয়। প্রশাসনিক কাজকর্মের নথি সংরক্ষণ ও ক্যাবিনেটের কাজে সাহায্য করার জন্য প্রথম এই ধরনের সচিবালয় গঠন করা হয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রশাসনিক পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতেও এরূপ ক্যাবিনেট সচিবালয় গড়ে তোলে। লর্ড ওয়েলিংটন (১৯৩১ - ৩৬) সর্বপ্রথম তাঁর ব্যক্তিগত সচিবকে ১৯৩৫-৩৬ সালের ক্যাবিনেটের কার্যবিবরণী নথিবদ্ধ করতে বলেন। ১৯৩৫ সালের পূর্বে তদানিন্তন ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেলের একজন ব্যক্তিগত সচিব ছিল, Private Secretary to the Viceroy (PSV) যিনি একইসঙ্গে প্রশাসনিক পরিষদের (Executive Council) কাজেও সহায়তা করতেন। এর কিছুকাল পরে দুটি পৃথক বিভাগের-গোড়াপত্তন করা হয় এবং দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। স্যার এরিক কোটস্ প্রাক্ স্বাধীন ভারতের প্রথম ক্যাবিনেট সচিব হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ভাইসরয়ের প্রশাসনিক পরিষদের সচিব হিসাবে পরিচিত হন। ইভ্যান জেনকিন্স ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সচিবের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রশাসনিক পরিষদের নাম পরিবর্তন করে ক্যাবিনেট সচিব রাখা হয়। এইচ. এম. প্যাটেল ছিল প্রথম ভারতীয় ক্যাবিনেট সচিব। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুসরণে ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ধারাকে গ্রহণ করা হয় এবং মন্ত্রীপরিষদের কাজে সাহায্য করার জন্য একটি নতুন সচিবালয় গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্বাধীনতার পর অধিকাংশ অভিজ্ঞ রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিকগণ বৃটেনে চলে যাওয়ায় ভারতবর্ষের প্রশাসনে কর্মী সংকট দেখা দেয়। অতঃপর ক্যাবিনেট সচিবালয় ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে সংযুক্তিকরণ করা হয়। কিছুদিন পরেই অবশ্য দুটি পৃথক অফিস গড়ে তোলা হয় এবং এন. আর. পিল্লাই ক্যাবিনেট সচিব হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এন. আর. পিল্লাই গ্রেট বৃটেনে গিয়ে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের কার্যবিলীর পরিদর্শন করেন ও অভিমত প্রকাশ করেন যে কিছু সংস্কার সাধন করে বৃটেনের ক্যাবেনেট সচিবালয়ের ভারতীয়করণ করা সম্ভব।

১৯৪৮ সালে Economic and Statistical Co-ordination Unit গঠিত হয় এবং ভারত সরকারের ক্যাবিনেট সচিবালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। বিভিন্ন সরকারী বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সরকারকে পরামর্শ প্রদান ও উন্নয়ন প্রকল্পের খসড়া প্রস্তুত প্রভৃতি দায়িত্ব এই সংস্থার হাতে ন্যস্ত হয়। ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হওয়ার পর উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত ও রূপায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় এই কমিশনের ওপর। ১৯৬১ সালে Central Statistical Organisation গঠিত হয় এবং পূর্বতন Central Statistical Unit এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। CSO কে অতঃপর একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং কালক্রমে ক্যাবিনেট সচিবালয় থেকে একে পৃথক করা হয়।

১৯৫৩ সালে পল এইচ এ্যাপেলবি (Paul Appleby) 'A Survey of Public Administration in India' এর রিপোর্ট পেশ করেন এবং তাঁর সুপারিশক্রমে Organisation and Methods Division তথা সংগঠন ও পদ্ধতি বিভাগ গঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের সকল বিভাগের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ (Administrative Reforms Department) গঠন করে O & M বিভাগের কর্মভার এই নবনির্মিত বিভাগটির হাতে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেটকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য 'Emergency Wing' গঠন করা হয়। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় 'Intelligence Wing'. ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারত-পাকযুদ্ধে প্রভাবিত অঞ্চলে ত্রাণ কার্য সম্পাদনের জন্য 'Directorate-General of Resettlement' গঠন করা হয়, ক্যাবিনেট সচিবালয়ের এই অংশটি অবশ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে এই বিভাগের দায়িত্ব Department of Rehabilitation এর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

১৯৭০ সালে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের কাজ আরো সম্প্রসারিত হয়। এইভাবে প্রতিনিয়ত ক্যাবিনেট সচিবালয়ের সঙ্গে নতুন বিভাগ যুক্ত হতে থাকে, অর্থাৎ ক্যাবিনেট সচিবালয়ের কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বাড়তে থাকে ও ক্রমে তা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে।

৩.৩ ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গঠন

ক্যাবিনেট সচিবালয়ের বর্তমান গঠন ও কাঠামো সম্বন্ধে আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে, এই সচিবালয়ের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছেন ক্যাবিনেট সচিব, তাঁর অধস্তন হিসাবে কাজ করেন নিরাপত্তা (Security), সমন্বয় (Co-ordination) এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণ শাখার (Research and Analysis Wing) সেক্রেটারীত্রয়।

নিরাপত্তা সচিব - প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের তদারকি করেন, তাঁকে সাহায্য করেন নিরাপত্তা যুগ্ম সচিব এবং ডিরেক্টর, (Special Protection Group)। বর্তমানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদেরও শারীরিক নিরাপত্তা প্রদান করেন SPG।

সমন্বয় সচিব - ক্যাবিনেট মিটিং এর বিষয়সূচী প্রস্তুত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করা সমন্বয় সচিবের অন্যতম দায়িত্ব। তাঁকে সাহায্য করেন অতিরিক্ত সমন্বয় সচিব, সমন্বয় যুগ্ম সচিব ও যুগ্ম তদন্ত কমিটির যুগ্ম সচিব (Joint Interrogation Committee) । নিরাপত্তা সচিব ও JIC এর সচিব উভয়েই অভিজ্ঞ IPS আধিকারিক।

গবেষণা ও বিশ্লেষণ শাখার সচিব - দেশের বাহ্যিক নিরাপত্তা তথা সার্বভৌমিকতা রক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও ব্যবস্থা নির্দেশ করার দায়িত্বে রয়েছেন, মূলত এই সচিব মহাশয়। RAW এর সচিব নিরাপত্তা শাখার Director General এবং Special Frontier Force and Aviation (পর্যটন) এর প্রধান হিসাবেও কাজ করেন। তাঁকে কার্যনির্বাহে সহায়তা করেন বিশেষ সচিব, RAW, যুগ্ম সচিব (R AW) প্রমুখরা।

১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময়ে RAW এর ভূমিকা ও কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

১৯৮৮ তে ক্যাবিনেট সচিবালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ গ্রহণ করবার জন্য গঠন করা হয় Directorate of Public Grievances; রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা, রেলপথ, ডাক ও যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এর আওতায় পড়ে।

ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গঠন কাঠামো হ'ল নিম্নরূপ —

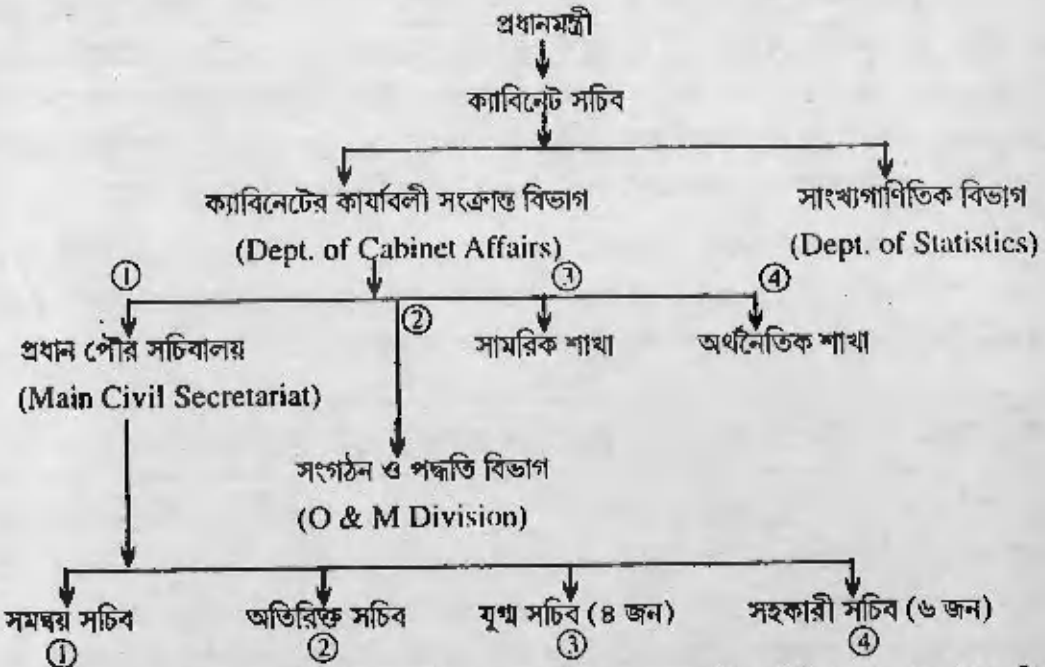

ক্যাবিনেট সচিবালয়ের এই বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয় কয়েকটি কমিটির মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর ক্যাবিনেট Rule 6 of the Government of India (Transactions of Business) Rules, 1961 অনুযায়ী প্রয়োজনানুসারে এই কমিটিগুলি গঠন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

১) নিয়োগ কমিটি

২) অর্থনৈতিক সমন্বয় কমিটি

৩) সংসদ ও আইন সংক্রান্ত কমিটি

৪) রাজনৈতিক বিষয় কমিটি

৫) খাদ্য ও কৃষি কমিটি ইত্যাদি

প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের জন্য বিভাগীয় সচিবদের নিয়ে কয়েকটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় — যথা -

1) Committee of Economic Affairs (অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি)

2) Secretaries' Committee on Foreign Affairs (বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত সচিবের কমিটি)

3) Scientific Advisory Committee to the Cabinet (বিজ্ঞান সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি।

সংসদীয় গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্র এত কেন্দ্রপ্রবণ চরিত্র গ্রহণ করেছে যে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ক্যাবিনেটের হাতে ক্ষমতারও কেন্দ্রীভবন ঘটেছে এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের ক্ষমতাও ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে বিগত কয়েক বছর ধরে সম্মিলিত সরকারের যে ধারা শুরু হয়েছে, বিশেষতঃ তাদের স্থায়ীত্বের অভাব যেভাবে ভারতের জাতীয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে, তা ক্যাবিনেট সচিবালয়ের ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি করেছে।

রাজীব গান্ধীর সময়কালে ক্যাবিনেট সচিবালয় 'Super Cabinet' নামে পরিচিত হয় এবং প্রকৃত কর্তৃত্ব হস্তগত করে। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের গুরুত্ব এর ফলে এই সময়ে যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়। প্রশাসনে দক্ষতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকা আবশ্যক।

৩.৪ ক্যাবিনেট সচিবালয়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যকরী ভূমিকার মূল্যায়ন

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতির জন্য আইন ও শাসন সংক্রান্ত দায়িত্বের অধিকাংশই বর্তায় ক্যাবিনেটের ওপর। উপরন্তু জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে নিছক পুলিশি রাষ্ট্রের গন্ডী পেরিয়ে সার্বিক ভাবে জনজীবনকে প্রভাবিত করে এমন অনেক কাজের দায়িত্বভারই গ্রহণ করতে হয়। এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে ক্যাবিনেটের কাজের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব প্রধানতঃ ক্যাবিনেটকে নিতে হয়। এছাড়া সামাজিক উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ জাতীয় প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ প্রভৃতি বিষয়েও ক্যাবিনেটের ভূমিকা অবজ্ঞাযোগ্য নয়। জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা থেকে শুরু করে উপরিউক্ত বা অনুক্ত যাবতীয় কাজে ক্যাবিনেটকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করাই ক্যাবিনেট সচিবালয়ের প্রধান কাজ।

ক্যাবিনেট মিটিং এর কর্মসূচী প্রস্তুত, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তাকে যথাযথভাবে ক্যাবিনেটে উপস্থাপন করা, ক্যাবিনেটের আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে রেকর্ড করা প্রভৃতি ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে পড়ে। ক্যাবিনেট মিটিং-এ গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রেরণ করা এবং সিদ্ধান্তের রূপায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থার কাজের তদারকি করা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করাও ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গুরুদায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই সকল সংস্থা ও বিভিন্ন মন্ত্রকগুলি ক্যাবিনেট সচিবালয়ের এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য আবশ্যক তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকে। প্রত্যেক মাসে প্রতিটি মন্ত্রক তাদের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের

কাছে রিপোর্ট প্রেরণ করে। কোনও মন্ত্রকের কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে ক্যাবিনেট সচিবালয় তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। সরকারী সিদ্ধান্ত ও গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও সরকারের সমস্ত বিভাগকে নিয়মিত অবগত রাখা ক্যাবিনেট সচিবালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সরকারী কাজসংক্রান্ত বিধিনিয়ম প্রস্তুতের দায়িত্বও ক্যাবিনেট সচিবালয় বহন করে।

প্রাথমিকভাবে উপরিউক্ত কাজগুলি সম্পাদন করার পরের পর্যায়ে ক্যাবিনেট সচিবালয় বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রকের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্প বা সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতে হ'লে অনেক সময়ই আন্তঃবিভাগীয় বৈঠক ডাকতে হয়। এই বৈঠকে প্রতিটি তথ্য ও বক্তব্য যাতে সুসংহত ও সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়। সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ক্যাবিনেট সচিবালয়ের কাজ। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে দুটি বিভাগ সহমত হ'তে পারছে না, বিশেষজ্ঞ অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে অন্য বিভাগের বিরোধ দেখা দিতে পারে। নীতিগত প্রশ্নে এই বিরোধ দেখা দিলে জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচিত হয়। প্রশাসনিক জটিলতা যত বৃদ্ধি পায়, বিরোধের নিষ্পত্তি করা ততই সমস্যা হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সময়াভাব হলে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন বিভাগীয় সচিবদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টা করা হয়।

১৯৮৮ সালে অর্থমন্ত্রক ও বাণিজ্যমন্ত্রকের মধ্যে এরূপ বিরোধ উৎপন্ন হয়। সফটওয়্যারে কর হ্রাসের প্রশ্নে এই দুই বিভাগের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠলে ক্যাবিনেট সচিব বিভিন্ন বিভাগীয় সচিবদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করেন।

ক্যাবিনেট সচিবালয় অপর যে সকল কাজ করে থাকেন, তার মধ্যে অন্যতম হল - রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রী ও আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক আনীত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান। বিল ও অর্ডিন্যান্স সংক্রান্ত প্রশ্নে, পার্লামেন্টে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বার্তা সংক্রান্ত বিষয়ে, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি বা বিদেশে দূত প্রেরণ প্রভৃতি সকল বিষয়ে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

৩.৫ ক্যাবিনেট সচিব

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা অনুমান করা কষ্টকর নয়, যে সরকারী কাজের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের সচলতা ও দক্ষতার ওপর। রাজনৈতিক স্তরে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে ক্যাবিনেট সচিবালয় পরিবর্তিত সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে। প্রশাসনিকস্তরে এর নেতৃত্বে থাকেন ভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রবীনতম আধিকারিকদের মধ্যে অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি ক্যাবিনেট সচিবের পদ অলঙ্কৃত করেন।

ক্যাবিনেট সচিবালয়ের তিনটি শাখায় মোট ৫০০ (পাঁচশর ও অধিক) পদে কর্মী নিযুক্ত আছে, এই বিশাল কর্মযজ্ঞের পরিচালক হলেন ক্যাবিনেট সচিব। স্বাভাবিকভাবেই গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের অভিমত অনুযায়ী "He (the Cabinet Secretary) should be an administrative officer of the highest rank, selected for the office for his special qualities of tact, energy, initiative, and efficiency .... He should

be a person commanding the respect and confidence of all ranks of the permanent services."[1] ভারতীয় সংবিধানে ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর পদের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ১৯৪৯ সালে যে 'Report on Reorganisation of the Machinery of Government' পেশ করেন, তাতে তিনি এই পদের গুরুত্বের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেন। ভারতে আমলাতন্ত্র যে ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত, তার সর্বোচ্চ স্তরে ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর অবস্থান। ক্যাবিনেট সেক্রেটারী প্রধানমন্ত্রী, সমগ্র ক্যাবিনেট ও তার কমিটিগুলির মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন।

তিন থেকে চার বছরের কার্যকালে ক্যাবিনেট সেক্রেটারী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু কোনও বিভাগের কাজে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করা তার এক্তিয়ারের বাইরে। কোনও বিভাগের প্রশাসনিক বিষয়েও তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, কারণ প্রত্যেক বিভাগের নিজস্ব সচিব এই কাজটি করে থাকেন। প্রত্যেক বিভাগীয় সচিব ও অন্যান্য আধিকারিকরা অবশ্য ক্যাবিনেট সচিবের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মূল্য দেন ও তাকে প্রধান পরামর্শদাতা ও-পথনির্দেশক বলে মনে করেন। 'From the account of his relationship with permanent officials, it would appear that he is a sort of advisor and conscience - keeper to all the permanent officials. They come to him for advice and guidance whenever there are interdepartmental difficulties. He seems to be a man in whom all permanent officials have great confidence.'[2] ক্যাবিনেট সচিব রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিকদের উৎসাহ যেমন বৃদ্ধি করেন, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আমলাদের বিরোধের প্রশ্নে আমলাতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার ওপর তার পদমর্যাদা নির্ভর করে। নরেশ চন্দ্র, বি. জি. দেশমুখ, টি. এন. শেষণ, এস. এন. রাজাগোপাল, জাফর সইফুল্লা প্রমুখরা স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটিয়ে বিভিন্ন সময়ে এই পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

ক্যাবিনেটের বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে যথাযথভাবে জানানো ও তার রূপায়নে ঐ বিভাগকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর অন্যতম দায়িত্ব। কোনও কারণে উক্ত বিভাগ সিদ্ধান্ত রূপায়নে বিলম্ব করলে, সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করা ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ একটি কাজ। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, ক্যাবিনেটের বৈঠকে একদিকে যেমন বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়, তেমনি মন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্যও হয়। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ও মন্ত্রীপরিষদের যৌথ দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ রেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ববর্তী আলোচনা বা বিতর্কের বিষয়টি একান্ত গোপন রাখা ক্যাবিনেট সচিবের একটি সবিশেষ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা হিসাবে ক্যাবিনেট সচিবের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল প্রশাসনিক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সচিবের পরামর্শ গ্রহণ করেন। Chief Secretaries Committee এর চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে তিনি সমস্ত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ প্রধানমন্ত্রীকে দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য এস. আর. মহেশ্বরী এর বক্তব্য উপস্থাপিত করা আবশ্যক। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, 'He (Cabinet Secretary) is the link between the Prime Minister's Office and various administrative departments.

Above all, he is the link between the political World and the Civil Service. This job description presents a rough profile of the functionary though the importance of this position has been somewhat overshadowed by the Prime Minister's Office headed by the Secretary to the Prime Minister'[3]

ক্যাবিনেট সচিব প্রশাসনিক কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীপরিষদের পরিবর্তন হতে পারে। অনেকসময় মধ্যবর্তী পর্যায়েও ক্ষমতাসীন সরকারের পতন হয় এবং পুর্ননির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তদারকি সরকার প্রশাসনিক কাজ চালান। প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতা এই সকল ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অসুবিধার কারণ হিসাবে উপস্থিত হয়। ক্যাবিনেট সচিব এক্ষেত্রে নীতি গ্রহণ, নীতি রূপায়ণ ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীপরিষদকে আরো সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। অনেকসময় এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির ওপরও তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

S. S. Khera এর অভিমত অনুসারে ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর কয়েকটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে। আইনানুযায়ী কোনও প্রকাশক বা সংবাদপত্রের এডিটরের বিরুদ্ধে যদি কোন মন্ত্রী মানহানির মামলা করতে চান, সেক্ষেত্রে ক্যাবিনেট সেক্রেটারী পূর্বানুমতি প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের রায়েও ক্যাবিনেট সচিবের এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৫.১ মুল্যায়ন

এযাবৎ আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ক্যাবিনেট সচিবের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও উত্থান পতনের সাক্ষী এই সচিব মহোদয়ের পদটি স্পর্শকাতরও বটে। বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে মতদ্বৈততা অনেক সময়ই তাকে অসুবিধার সম্মুখীন করে। এমতাবস্থায় ক্যাবিনেট সচিবের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তাই এক্ষেত্রে ক্যাবিনেট সচিবের পদটির অরাজনৈতিক চরিত্র ও মর্যাদা বজায় রাখতে পারে। "Utmost care must be taken to choose the functionary to protect it from becoming politicized, a danger which is not merely theoretical in today's India."[5] অর্থাৎ দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদটিকে রক্ষা প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার হওয়া একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়।

৩.৬ সারাংশ

ভারতীয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল শাসন বিভাগ ও তার সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সচিবালয়। ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের গুরুত্ব যেহেতু ক্রমবর্ধমান, অতএব ক্যাবিনেট সচিবালয় ও তাঁর সচিবের ভূমিকা ও গুরুত্বও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্যাবিনেট সচিব পদটির গুরুত্বই উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে এই পদ লাভের জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। ক্যাবিনেট সচিব এক উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকের মর্যাদা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের

ওপর তার প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণেই সম্ভবতঃ ক্যাবিনেট সচিবের নিয়োগ ও অপসারণে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠছে। যাই হোক, ক্যাবিনেট সচিবের দায়িত্ববোধ, নাগরিক সমস্যা সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা, ভারতীয় প্রশাসনে তার অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, মেধা, ভারতীয় প্রশাসনের গুণগত মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে।

৩.৭ প্রশ্নমালা

১) সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন ঃ

ক) ক্যাবিনেট সচিবালয় প্রথম গঠিত হয় ১৯২৬/১৯১৬/১৯৪৬ সালে।

খ) প্রাক্ স্বাধীন ভারতে প্রথম সচিব হিসাবে নিযুক্ত হন — স্যার এরিক কোটস্ / ইভ্যান জেনকিন্স / স্যার মরিস হ্যাকি।

গ) প্রথম ভারতীয় ক্যাবিনেট সচিব হন — এন. আর. পিল্লাই / এইন. এম. প্যাটেল / এল. কে. ঝা।

ঘ) ক্যাবিনেট সচিবালয় 'Super Cabinet' হিসাবে পরিচিত হয় মোরারজী দেশাই / ইন্দিরা গান্ধী / রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে।

২) একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

ক) Q & M বিভাগ কবে ও কেন গঠিত হয়?

খ) 'Emergency Wing' কেন ও কবে গঠিত হয়?

গ) ক্যাবিনেট সচিবের অধস্তন স্তরে যে তিন সচিব দায়িত্ব সম্পাদন করেন তারা কোন বিভাগের দায়িত্বে আছেন?

ঘ) Directorate of Public Grievances কবে ও কেন সংযোজিত হয়?

৩) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। (১৫০টি শব্দের মধ্যে) ঃ

ক) ক্যাবিনেট সচিবের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি উল্লেখ কর।

খ) ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গঠন বিশ্লেষণ করুন।

গ) ক্যাবিনেট সচিবালয়ের কাজ ও ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

ঘ) ক্যাবিনেট সচিবের পদের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

ঙ) স্বাধীন ভারতে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গঠন বৈশিষ্ট্যে যে সংযোজন ও পরিবর্তন ঘটেছে তা উল্লেখ করুন।

৪) সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন (৫০টি শব্দের মধ্যে) :

ক) ক্যাবিনেট সচিবালয়ের কমিটি ব্যবস্থার উল্লেখ করুন।

খ) ক্যাবিনেট সচিবালয় কিভাবে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করে?

গ) প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা ও সহায়ক হিসাবে ক্যাবিনেট সচিবের ভূমিকা কি?

৩.৮ উত্তর সংকেত

১) ক) ক্যাবিনেট সচিবালয় প্রথম গঠিত হয় ১৯১৬ সালে।

খ) প্রাক্ স্বাধীন ভারতে প্রথম সচিব হিসাবে নিযুক্ত হন স্যার এরিক কোটস্।

গ) প্রথম ভারতীয় ক্যাবিনেট সচিব হন — এইচ. এম. প্যাটেল।

ঘ) ক্যাবিনেট সচিবালয় 'Super Cabinet' হিসাবে পরিচিত হয় রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে।

২) ক) ১৯৫৩ সালে পল এইচ এ্যাপেলবি 'A Survey of Public Administration in India' এর রিপোর্ট পেশ করেন এবং তাঁর সুপারিশক্রমে Organisation And Methods Division তথা সংগঠন ও পদ্ধতি বিভাগ গঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের সকল বিভাগের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি।

খ) ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেটকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য 'Emergency Wing' গঠন করা হয়।

গ) ক্যাবিনেট সচিবের অধস্তন হিসাবে কাজ করেন নিরাপত্তা, সমন্বয় এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণ শাখার সেক্রেটারীত্রয়।

ঘ) ১৯৮৮ তে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের সঙ্গে এই বিভাগ সংযোজিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য এই বিভাগ গঠিত হয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা, রেলপথ, ডাক ও যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এর আওতায় পড়ে।

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Arora, Ramesh K., Goyal, Rajni, *Indian Public Administration*, New Delhi, Wishwa Prakashan, P.132

২) ibid., P.133

৩) Maheshwari, S. R., *Indian Administration*, New Delhi, Orient Longnan Ltd., P.31.

৪) Khera, S. S. *The Central Executive*, New Delhi, Orient Longman, 1975, P.182

৫) Maheshwari, S. R., *op cit.*, P. 33

একক ৪ □ কেন্দ্রীয় সচিবালয়

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের গঠন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

৪.৩ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দায়িত্ব

৪.৪ সারাংশ

৪.৫ প্রশ্নমালা

৪.৬ উত্তর সংকেত

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে —

- কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সচিবালয়ে অবস্থান,
- কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের গঠন ও বিন্যাস,
- কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দায়িত্ব ও গুরুত্ব এবং
- কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কাজের পরিধি ও তার সীমা বিষয়ক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যাবে।

৪.১ প্রস্তাবনা

প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রীরা যে সকল রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিক ও কর্মচারীদের সাহায্যে এই গুরুদায়িত্ব বহন করে সম্মিলিতভাবে তাদের অফিসকে কেন্দ্রীয় সচিবালয় বলা হয়। "The Secretariat, being an office, is the organisation to assist the Government in the fulfilment of its responsibilities."[1]

প্রাক্ স্বাধীন ভারতবর্ষে সরকারী কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে সচিবালয়ের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ামে প্রেসিডেন্ট ও তার পরিষদ একজন সচিব ও তাঁর সহকারীদের নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেসলি প্রকৃত অর্থে সচিবালয় গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালে মন্টেগু - চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে কেন্দ্রীয় ও

আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার মধ্যে সীমারেখা টানার চেষ্টা হয়, উভয় সরকারই নিজস্ব এক্তিয়ারের মধ্যে নীতি প্রণয়ন, রূপায়ণ ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব বহন করতে উদ্যোগী হয়। তদনুযায়ী সচিবালয়ের ভূমিকাও বিস্তৃত হয়। নিছক তদারকী ও সমন্বয়কারী সংস্থার পরিবর্তে সচিবালয় একটি প্রকৃত প্রশাসনিক সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সরকারের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে, ফলে সচিবালয় প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও নীতি প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। সেই অনুপাতে সচিবালয়ের কর্মী সংখ্যাও ২৯ (১৯১৯) থেকে ২০০ হয় (১৯৩৯)। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রথমেই কর্মী সংকট দেখা দিল। ব্রিটিশ ও মুসলিম ICS আধিকারিকরা যথাক্রমে বৃটেনে ও পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় এই সংকট সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালে গৃহীত সংবিধান অনুযায়ী ভারতবর্ষ যে বিবিধ জনকল্যানমূলক কাজ করতে উদ্যোগী হয়, তার জন্য প্রয়োজন ছিল বহু দক্ষ আধিকারিক। অধস্তন স্তর থেকে পদোন্নতি এবং জরুরী নিয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সচিবালয়কে পরিপূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এস. আর. মহেশ্বরী এর মতে, "... as a concept, the Secretariat is an essential institution in the public administration of the country, being both inevitable and desireable. Indeed, no one can seriously question its indefinite continuance in the system of Government in India."[2] এক কথা কেন্দ্রীয় সচিবালয় ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা।

কেন্দ্রীয় সচিবালয়কে সরকারের স্নায়ুকেন্দ্র (nerve centre) বলা হয়, যা সরকারী প্রশাসনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রধান দুটি প্রশাসনিক নীতির ওপর ভিত্তি করে এই কেন্দ্রীয় সচিবালয়কে গঠন করা হয়েছে।

১) নীতি প্রণয়ন ও নীতি প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ ও

২) সমগ্র প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত দক্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে স্থায়ীভাবে দায়িত্ব অর্পণ।

এ প্রসঙ্গে L. S. Amery বলেছেন যে, "It is only by the creation of a separate policy department, a general staff freed from administration as a whole, that it is possible to secure forethought and effective planning."[3]

গ্রেট বৃটেনে এই দ্বিতীয় নীতিটি অনুসরণ করা হয় না। ভারত ও সুইডেনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এই নীতি অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে।

৪.২ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের গঠন, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

সি. এস. এস. বা কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয় স্বাধীনতা লাভের প্রাক্‌কালেই। ভারতে জাতি গঠনের (Nation-Building) স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য যে বিশাল কর্মযজ্ঞ হাতে নেওয়া হয়, তা রূপায়নের জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ, অভিজ্ঞ কর্মীবর্গ, যাদের সহায়তা ছাড়া কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে শাসনকার্য চালনা করা সম্ভব নয়। Central Secretariat Reorganisation and Reinforcement প্রকল্পের অনুমোদনক্রমে

স্বাধীন ভারতের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন সচিবালয় গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। সচিবালয়ে (Central Secretariat Service) নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় —

1) Under Secretary Class - I [অধস্তন সচিব]

2) Section Officer Class - I [বিভাগীয় অধিকর্তা]

3) Section Officer Class - II [বিভাগীয় অধিকর্তা]

4) Assistants-Class - III (Non-gazetted)
[সহকারী]

১৯৫৯ সালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীকে একত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত করা হয় এবং একটি নতুন শ্রেণী তথা নির্বাচিত স্তর (Selection-Grade) সৃষ্টি করে সহকারী সচিব ও তদুর্দ্ধ আধিকারিকদের এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের স্তরবিন্যাস ঃ

Department বা (বিভাগ)

Secretary (সচিব)
↓
Additional / Joint Secretary (অতিরিক্ত / যুগ্ম সচিব)
(Wing)
↓
Deputy Secretary (Division) (উপ সচিব)
↓
Under Secretary (Branch) (অধস্তন সচিব)
↓
Section Officer (Section) (বিভাগীয় সচিব)

ভারতবর্ষের সচিবালয়ের গঠন বিন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল, পিরামিডের আকৃতিতে সজ্জিত এই সংস্থার উর্ধতন আধিকারিকরাও প্রশাসনের নিম্নস্তরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করেন। নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে যোগসূত্র বজায় থাকায় নিম্নবর্তী স্তরে দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের বিকেন্দ্রীকরণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। Assistants (সহকারী) এবং Section Officers (বিভাগীয় অধিকর্তা) নির্দিষ্ট মন্ত্রকের জন্যই নিযুক্ত হন, অর্থাৎ এদের ওপর বিভাগীয় মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণই যথার্থ বলে বিবেচিত হয়। তবে প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সমস্ত বিভাগের কর্মীদেরই সমান সুযোগ

দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ওপর কর্মী বিভাগের (Department of Personnel) এর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কর্মীদের ইচ্ছানুসারে সচিবালয়ের বাইরের কোনও অধস্তন বা সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানে তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত আধিকারিকরা কেবলমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত স্তরে (selection grade) উন্নীত হতে পারেন, তবে তার জন্য এই সকল অফিসারকে অন্ততঃ ৫ বছর প্রথম শ্রেণীতে কাজ করতে হবে। সেক্সন অফিসারদের ক্ষেত্রে এক-ষষ্ঠাংশ (1/6) পদ I.A.S. পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে পূরণ করা হয়। অবশিষ্ট পদগুলির দুই-তৃতীয়াংশ (2/3) অ্যাসিস্টান্ট স্তর থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূর্ণ করা হয় এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ (1/3) পদে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের দ্বারা পরিচালিত বিভাগীয় পরীক্ষার রেজাল্টের ওপর ভিত্তি করে লোক নিয়োগ করা হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট স্তরে পঞ্চাশ শতাংশ পদ U.P.S.C এর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বাকী পদে C.S.S. (Central Secretariat Service) এর U.D.C শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীদের উন্নীত করা হয়।

১৯৪৮ সালেই কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের কথা ভাবা হয়। বর্তমানে Institute of Secretariat Training and Management প্রতিষ্ঠা করে এই প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সচিবালয় যে ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত, তার সর্বোচ্চ পদে রয়েছেন, সেক্রেটারী, যিনি বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রধান। কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, ক্যাবিনেট সচিবালয় ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সেক্রেটারী নিয়োগের বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রধানমন্ত্রীই অবশ্য এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিভাগীয় সচিব হলেও প্রথমত তিনি ভারত সরকারের সচিব, অতঃপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ ও উদার হওয়া আবশ্যক। তথ্য সংগ্রহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা, বিভিন্ন ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিটি ও সম্মেলনে নিজের বিভাগকে উপস্থাপিত করা, বিভিন্ন কাজের মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব তিনি বহন করেন।

অতিরিক্ত সচিব প্রধানতঃ সচিবকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চস্তরে তাঁর নিয়োগ চূড়ান্ত হয়, এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, যে সকল বিভাগ অতিরিক্ত কর্মভারে দিশাহারা, সেই সকল বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অতিরিক্ত সচিব মহোদয় বহন করবেন।

যুগ্ম সচিব বিভাগীয় নীতি নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিচয় রাখেন। অনেক সময় স্বাধীনভাবে একটি বিভাগের কোনও নির্দিষ্ট অংশের দায়িত্ব বহন করেন। যুগ্ম সচিবের তলায় আছেন, নির্দেশক, সহকারী সচিব ও অধস্তন সচিব, যারা প্রশাসনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

৪.৩ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দায়িত্ব

সচিবালয়ের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ

১) বিভিন্ন মন্ত্রকগুলিকে নীতি প্রণয়নে সাহায্য করা।

ক) নিয়মিত নীতি তৈরী ও প্রচলিত নীতির পর্যালোচনা এবং পরিবর্তন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ।

খ) বিধি, নিয়ম ও আইনের খসড়া প্রস্তুত।

গ) বিভাগীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প রূপায়নে সহায়তা করা।

ঘ) বাজেট প্রস্তুত, আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি।

ঙ) বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হয়, তা লক্ষ রাখা ও স্বীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

চ) বিভিন্ন বিভাগীয় নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ছ) সাংগঠনিক কর্মকুশলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ।

জ) আইনসভা কর্তৃক সমর্পিত দায়িত্বের যথাযথ পালন।

২) সচিবালয়কে চিন্তার ভাঁড়ার (Think tank) বলে অভিহিত করা হয়। অতীত ও বর্তমানের আলোকে কর্মসূচী নির্ধারণে কেন্দ্রীয় সচিবালয় মন্ত্রীপরিষদকে সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় সচিবালয় যেহেতু একটি স্থায়ী সংস্থা, অতঃপর প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় সচিবালয় একটি অপরিহার্য সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সচিবরাই প্রশাসনে গতিশীলতা ও আধুনিকীকরণের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে।

৩) পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এই কেন্দ্রীয় সচিবালয়।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে ঃ

"The Secretariat System of work has lent balance, consistency and continuity to the administration and serves as a nucleus for the total machinary of a ministry. It has facilitated inter-ministry co-ordination and accountability to parliament at the ministerial level. As an institutionalised system, it is indispensable for the proper functioning of the Government."

সংক্ষেপে বলা যায় সরকার-এর উপযুক্ত এবং কার্যকরী ভূমিকা সম্পাদনে সচিবালয় সংস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সচিবালয়ের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার আয়তনও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৪৬ সালে সর্বমোট ২০টি বিভাগ ছিল, যার মধ্যে কয়েকটি ছিল অস্থায়ী। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ১৮টি মন্ত্রকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্ব যত বাড়তে থাকে, মন্ত্রকের সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। বর্তমানে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী কমবেশী ৫০টি মন্ত্রক আছে এবং প্রতিটি মন্ত্রকের অধীন একাধিক বিভাগ আছে, যেমন - অর্থমন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত হল অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ, ব্যয়সংক্রান্ত বিভাগ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ। প্রতিটি মন্ত্রক ও গুরুত্বপূর্ণ সকল বিভাগের দায়িত্বে থাকেন একজন সচিব ও প্রয়োজনমত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব ইত্যাদিগণ। বর্তমানে সচিবের সংখ্যা প্রায় ৭১ জন, অতিরিক্ত সচিব ৫৮ জন, যুগ্ম সচিব ২৮১ জন, নির্দেশক ১৯৫ জন, সহকারী সচিব ১৪০, অর্ধভজন সচিব ১৮১ জন। এছাড়া আছে Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) বা কেন্দ্রীয় সচিবালয় স্টেনোগ্রাফার পরিষেবার কর্মীগণ, যারা চারটি স্তরে

বিন্যস্ত এবং Central Secretariat Clarical Service (CSCS) বা কেন্দ্রীয় সচিবালয় করণিক পরিষেবার কর্মীরা, যারা U.D.C ও L.D.C এই দুটি স্তরে বিন্যস্ত। এই বিপুল আয়তন কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের জন্য সমস্যার কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

ARC প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন এ প্রসঙ্গে তার রিপোর্টে বলেছে যে, "The Secretariat at the centre is thus today encumbered with non-essential work and has for a large part, become an unwieldy and over-staffed organisation"[5]

এই কমিশনের মতে, এর ফলে একদিকে যেমন কর্মী ও আধিকারিকদের গুণগত মানে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, তেমনি দায়িত্বে শিথিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্বকে অস্বীকার করায় উর্দ্ধতন আধিকারিকদের কাজে চাপ বেড়েছে ও কাজে শ্লথ গতি এসেছে।

ARC প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উল্লেখ করা যায় যে, কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কাজ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ককেও যৎপরনাস্তি প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। রাজ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত, প্রভৃতি কাজে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের হস্তক্ষেপ অযাচিত নয়। কিন্তু বহু রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ রাজ্যস্তরে সমস্যা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ করা হয়।

ARC এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারের প্রশাসনিক সংস্থাগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সম্পর্ক অনেকক্ষেত্রেই চিন্তার কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা রূপায়ন, সমন্বয় সাধন, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য, কিন্তু ARC এর মতে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য থাকা আবশ্যক।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সচিবালয়ে 'বাবু বুরোক্রেসীর' (আমলা) প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। অফিস রেকর্ড সংরক্ষণ জাতীয় কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত বিষয়ে বা অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের দিকেও সমান নজর দেওয়া উচিৎ। "The maxims of rationality, simplicity, efficiency and economy have perennial significance and therefore, there is constant need to strengthen these values in the working of the Central Secretariat[6]. অথবা অন্যভাবে বলা যায়, বিধিবদ্ধতা, আইন কানুন প্রয়োগের সরলীকরণ, দক্ষতা এবং ব্যয় স্বল্পতার বিষয়গুলি মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় সচিবালয়কে যুগোপযুগী করে তার সংস্থাগত স্থিতি রক্ষা করে চলার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

৪.৪ সারাংশ

পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপায়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রকমূলক, সংস্কারধর্মী ও জনকল্যাণকামী কার্যকলাপের ক্রমবর্ধমান গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সচিবালয়ের কর্মদায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রীগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব পালনে সচিবালয়ই হল প্রধান সহায়ক। নীতি-নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ, আইনের খসড়া প্রস্তুত,

* (ARC) Administrative Reform Commission

সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রয়োজনীয় সুপারিশ দান, বিচার বিশ্লেষণ, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, এমনকি সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারের স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে একে অভিহিত করা হয়। ক্ষেত্রগত পরিকল্পনা ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নেও সচিবালয় কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করে।

সচিবালয়ের বিরুদ্ধে বর্তমানে অন্য সংস্থার কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মনসংযোগ নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা, আমলাতান্ত্রিকতা, দপ্তরকেন্দ্রীকতা, জনসংযোগহীনতার অভিযোগ করা হয়। সচিবালয় অনেক সময়ে কাজে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করে ও শ্লথ গতিতে কার্য সমাধা করে। সচিবালয়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত আয়তন বৃদ্ধি এর সচলতা বিনষ্টের কারণ হিসাবে মনে করা হয়।

তথাপি এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে প্রশাসনিক কর্মকুশলতা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করলে কেন্দ্রীয় সচিবালয় অবশ্যই ভারতীয় প্রশাসনকে গতিশীল করতে সহায়ক হবে।

৪.৫ প্রশ্নমালা

১) **সঠিক উত্তর চিহ্নিত করুন।**

ক) মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় — ১৯১৯/১৯৩৯/১৯০৯ সালে।

খ) নির্বাচিত শ্রেণী বা স্তর সৃষ্টি হয় ১৯০৯/১৯১১ / ১৯৫৯ সালে।

গ) সচিবালয়ের কাজের মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন পেশ করে UPSC / ARC / SPSC ।

২) **অল্প কথায় উত্তর দিন ।**

ক) কেন্দ্রীয় সচিবালয় বলতে কি বোঝেন?

খ) সরকারের স্নায়ুকেন্দ্র কাকে বলা হয়?

গ) অতিরিক্ত সচিবের কাজ কি?

৩) **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)**

ক) যে দুটি প্রশাসনিক নীতির ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সচিবালয় গঠিত হয়েছে তা উল্লেখ করুন।

খ) সচিবালয়ের আয়তন বৃদ্ধি সম্বন্ধে মন্তব্য করুন।

গ) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (ARC) কিভাবে সচিবালয়ের মূল্যায়ন করেছে?

৪) **উত্তর দিন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)**

ক) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের গঠন বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস ব্যাখ্যা করুন।

খ) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করুন।

গ) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে নিযুক্ত সচিবদের দায়িত্ব বর্ণনা কর।

৪.৬ উত্তর সংকেত

১) ক) মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে।

খ) নির্বাচিত শ্রেণী (Selection Grade) সৃষ্টি হয় ১৯৫৯ সালে।

গ) সচিবালয়ের কাজের মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন পেশ করে ARC।

২) ক) প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের মধ্যে বন্টিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রীরা যে সকল রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিক ও কর্মচারীদের সাহায্যে এই গুরুদায়িত্ব বহন করে, সম্মিলিতভাবে তাদের অফিসকে কেন্দ্রীয় সচিবালয় বলা হয়।

খ) কেন্দ্রীয় সচিবালয়কে সরকারের স্নায়ু কেন্দ্র বলা হয়, যা সরকারী প্রশাসনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

গ) অতিরিক্ত সচিব প্রধানতঃ সচিবকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে এই নিয়োগ চূড়ান্ত হয়, এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, যে সকল বিভাগ অতিরিক্ত কর্মভারে দিশাহারা, সেই সকল বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অতিরিক্ত সচিব মহোদয় বহন করবেন।

৩) ক) প্রস্তাবনা — শেষ অনুচ্ছেদ।

খ) ৪.৩ — দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ — সচিবালয়ের ক্রমবর্ধমান .....।

গ) ৪.৩ — তৃতীয় অনুচ্ছেদ — প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন।

৪) ক) ৪.২

খ) ৪.৩ — প্রথম অনুচ্ছেদ।

গ) ৪.২ — শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ।

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) Maheshwari, S. R., *Indian Administration*, (5th ed.) New Delhi, Orient Longman, 1995, P.37

২) *ibid*., P.38

৩) Amery, L. S., Thoughts on the Constitution, London, OUP, 1953, Second Edition, P. 88.

৪) Arora, Ramesh K., Goyal Rajni, *Indian Public Administration*, New Delhi, Wishwa Prakashan, 1995, P.141.

৫) Arora, Ramesh etc. opcit., P.153.

৬) *ibid*., P. 154

একক ৫ □ সঞ্চালক - সচিবালয়ের সঙ্গে সঞ্চালকের সম্পর্ক

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগে সঞ্চালকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

৫.৩ সচিবালয় ও সঞ্চালকের বিরোধ

৫.৪ সারাংশ

৫.৫ প্রশ্নমালা

৫.৬ উত্তর সংকেত

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে —

- সঞ্চালকের প্রশাসনিক অবস্থান
- সঞ্চালকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব এবং
- সচিবালয় ও সঞ্চালকের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যাবে।

৫.১ প্রস্তাবনা

সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক গতিশীলতাকে অব্যাহত রাখার জন্য ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক উন্নতির জন্য সচিবালয়ের সহযোগী হিসাবে সংযুক্ত কার্যালয় বা সঞ্চালকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সরকারী কাজকর্মের জটিলতা নানাবিধ কারণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রশাসনিক পরিকাঠামোরও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিস্তার ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীতি প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হ'তে শুরু করেছে। এই কারণেই "Under the Secretariat sprawls a network of agencies which are charged with the execution of policies"

এস. আর. মহেশ্বরী বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত এই শাসনবিভাগীয় সংস্থা সমূহকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

১) সংযুক্ত কার্যালয় বা সঞ্চালক (Attached office or Directorate) (কেন্দ্রীয় জনকার্য বিভাগ)

২) অধস্তন কার্যালয় (e.g. সর্দার প্যাটেল জাতীয় পুলিস একাডেমী, হায়দ্রাবাদ)

৩) বিভাগীয় কর্মদপ্তর (e.g. Ordinance factories) ইত্যাদি।

প্রশাসন পরিচালনার মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত সঞ্চালকের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। যে বিভাগের তথা মন্ত্রকের সঙ্গে তারা সংযুক্ত, সেই মন্ত্রক কর্তৃক গৃহীত নীতি রূপায়নের জন্য সঞ্চালক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করে। এই সকল নীতির সঙ্গে জড়িত কৌশলগত (technical) প্রশ্নেরও সমাধান নির্ণয় করে সঞ্চালক দপ্তর। কৌশলগত বিষয়াদিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করাও সঞ্চালকের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

একথা অনস্বীকার্য যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় নীতি গ্রহণের মুখ্য দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সচিবালয়ের ওপর। কেন্দ্রীয় জনপ্রশাসন মূলত যে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত তার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত এই সচিবালয় এবং সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে অধস্তন কার্যালয়। মধ্যবর্তী স্তরে যে সংযুক্ত কার্যালয় বা সঞ্চালকের অবস্থান, তা প্রশাসনিক সংস্থা হিসাবে উর্ধতন ও অধস্তন দুটি স্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। এই সংস্থার কর্মদায়িত্বই একে প্রশাসনের অবিচ্ছেদ অঙ্গে পরিণত করেছে। পূর্বে উল্লেখিত নীতি প্রয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব ছাড়াও নীতি গঠনেও এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যে কোনও নীতি গ্রহণ ও তার খসড়া প্রস্তুত করতে গেলে প্রয়োজন যথেষ্ট তথ্য, পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, কৌশলগত ও অন্যান্য তথ্যাদি যা সংগৃহীত হয় এই সংযুক্ত কার্যালয়ের মাধ্যমে। সচিবালয়কে এই সকল তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ করা সংযুক্ত কার্যালয় বা সঞ্চালকের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই কারণে সঞ্চালক অফিসের কর্মদায়িত্ব চিহ্নিত করতে গিয়ে S. R. Maheshwari উদ্ধৃত করেছেন যে - "Offices which are closely and directly associated with the Ministries or Departments of the Government of India in the shaping of policies by furnishing essential technical data and advice and providing executive directions to the Department etc. which are responsible for implementating the policies or decisions of the Government should be regarded as attaced offices"

৫.২ নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগে সঞ্চালকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

প্রশাসনিক কাঠামোর এক বিশেষ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এই সংযুক্ত কার্যালয়ের উদ্ভব হয়। নীতি গ্রহণ ও নীতি প্রয়োগ এই দুটি কার্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থাকে গড়ে তোলা হয়। এই সংস্থায় কর্মরত প্রশাসনিক প্রধানের ওপরেই এই গুরুদায়িত্ব বর্তায়। টোটেনহাম রিপোর্টে সেই কারণে বলা হয়েছে যে, মন্ত্রী মহোদয়ের কাজ নীতি নির্ধারণ, সচিবালয়ের কাজ উক্ত নীতি রূপায়ন এবং এই নীতি বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের তথা প্রয়োগের দায়িত্ব বর্তায় প্রশাসনিক প্রধানের ওপর, অর্থাৎ, মন্ত্রী তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সচিব মস্তিষ্ক (Brain) হিসাবে কাজ করেন এবং প্রশাসনিক প্রধান হলেন প্রশাসনের হস্তস্বরূপ।

সঞ্চালকের প্রশাসনিক গুরুত্ব অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও একথা উল্লেখ করা যেতে পারে, সকল মন্ত্রকের সংযুক্ত কার্যালয় নেই। ১৯৩৫ সালে নয়টি সঞ্চালক অফিস ছিল, যা পরবর্তীকালে বেড়ে হয় একত্রিশটি এবং বর্তমানে কমবেশী সত্তরটি সংযুক্ত কার্যালয় প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কার্যালয়ের নামোল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন -

১) স্বাস্থ্যমন্ত্রক—

সঞ্চালক সাধারণের অধীনস্থ স্বাস্থ্য কার্যালয়

২) অর্থ মন্ত্রক—

ক) জাতীয় সঞ্চয় কমিশনারের দপ্তর

খ) আয়কর পরিদর্শক সঞ্চালক

গ) গবেষণা, পরিসংখ্যান ও প্রকাশনার ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক সঞ্চালক

৩) খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রক—

ক) অর্থ ও পরিসংখ্যান সঞ্চালক

খ) বাজার ও পরিদর্শক সঞ্চালক

গ) ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সঞ্চালক

ঘ) চিনি ও বনস্পতিসংক্রান্ত সঞ্চালক ইত্যাদি

৪) ক্যাবিনেট সচিবালয়—

ক) কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার সঞ্চালক

খ) শিল্প-পরিসংখ্যান শাখার সঞ্চালক

গ) কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশন (CVC)

ঘ) কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (CBI) ইত্যাদি

৫) যোগাযোগ মন্ত্রক—

ডাক ও তার বোর্ডের সঞ্চালক সাধারণ ইত্যাদি।

৫.৩ সচিবালয় ও সঞ্চালকের বিরোধ

উন্নয়নশীল দেশে প্রশাসনকে যেমন গতিশীল হতে হয়, তেমনি সর্বব্যাপী হতে হয়। এর ফলে উন্নয়নমূলক প্রশাসনিক কাঠামোয় সাংগঠনিক জটিলতা ও কর্মব্যস্ততা উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় এটাই প্রত্যাশিত যে সংযুক্ত কার্যালয় এবং অধস্তন কার্যালয়ের দায়িত্ব সমোচিত বৃদ্ধি পাবে। বর্ধিত দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেলে নীতি প্রয়োগের বিষয়টিতে অসঙ্গতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের বন্টন ও পদমর্যাদার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সচিবালয়ের সঙ্গে সঞ্চালকের সম্পর্কে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সাধারণ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যে চিরকালীন টানাপোড়েন আছে, তারই সূত্র ধরে এই তিক্ততার উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন। নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগের মধ্যে যে সর্বজনবিদিত

সংঘাত আছে, তার প্রভাব ভারতীয় প্রশাসনেও পড়েছে। এরই পরিণাম হিসাবে একই কাজ দু'বার করে সম্পন্ন করা, অহেতুক শ্লথ গতি, সচিবালয়ের সঙ্গে সঞ্চালকের সংঘাত ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের বিষয়গুলির উদ্ভব হয়েছে।

সচিবালয়ে কর্মরত আমলারা বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বাস্তুবিদ, পরিসংখ্যানবিদ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ, যাঁরা নীতি প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের সাধারণ প্রশাসনের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেন না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, একবিংশ শতক উন্নত প্রশাসন প্রত্যাশা করে। সমাজ ও অর্থনীতির সার্বিক কল্যাণ তখনই যথার্থভাবে করা সম্ভব, যখন বিশেষজ্ঞের উদ্ভাবনী প্রতিভা সংযুক্ত হবে আমলাদের প্রশাসনিক কর্মকুশলতার সঙ্গে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, সচিবালয়েও সাধারণ আমলার পরিবর্তে প্রযুক্তিবিদ্‌দের স্থান দেওয়া উচিত, কারণ, এই যুগ হল প্রযুক্তির গৌরবময় অধ্যায়। বিশ্বায়নের যে প্রবল জোয়ার এসেছে, তাতে বিশ্ব বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করতে হবে। সংযুক্ত কার্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ভূমিকাকে অস্বীকার করবার জন্য সচিবালয় যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে, তা সুদক্ষ প্রশাসনের স্বার্থের অনুকূল নয়। নানান অজুহাতে সঞ্চালকের ত্রুটি চিহ্নিত করাই সচিবালয়ের অন্যতম কাজে পরিণত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, প্রশাসনের স্বার্থে সাধারণ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ উভয়ের গুরুত্বই অনস্বীকার্য। প্রশাসনিক মৌলিকতার প্রয়োজনে সচিবালয় ও সঞ্চালককে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে হবে। যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব প্রমুখের সঙ্গে সঞ্চালক প্রধানের পদমর্যাদার লড়াইকে দূরে সরিয়ে রেখে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র প্রশাসনে কর্মকুশলতাকে বৃদ্ধি করতে হবে।

এস. আর. মহেশ্বরী তার Indian Administration গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে আপাতদৃষ্টিতে সচিবালয় ও সংযুক্ত কার্যালয়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক অনুভূত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্কের প্রকৃতি ভিন্নতর হয়। এরূপ ছয় ধরণের সম্পর্ক প্রবাহিত হওয়ার বর্ণনা গ্রন্থকারিক করেছেন।

ক) মন্ত্রক ও সংযুক্ত কার্যালয়ের সম্পূর্ণ একীকরণ, যেমন, রেলওয়ে বোর্ড এবং রেলমন্ত্রক, ডাক ও তার বোর্ড এবং যোগাযোগ মন্ত্রক।

খ) মন্ত্রকের একজন অভিজ্ঞ আধিকারিকই সংযুক্ত কার্যালয়ের প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন ও নীতি প্রণয়ন ও নীতি প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই তার নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। শ্রম, নিয়োগ ও পুনর্বাসন মন্ত্রকের শ্রম ও নিয়োগ বিভাগের যুগ্ম সচিব একযোগে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের সঞ্চালক সাধারণ হিসাবে কাজ করেন।

কাজ ও আবাসন মন্ত্রকের কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি পুণর্গঠন সংক্রান্ত আধিকারিকদের কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে, তাতে উল্লেখ করা হয় যে, এই ধরণের ব্যবস্থায় সচিবালয় ও সংযুক্ত কার্যালয়ের মধ্যে দুরত্ব হ্রাস পায়। এই প্রতিবেদনে যে অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল - "...The System blurs completely the function of secretariat and the head of the Executive Department."[5]

গ) উক্ত সমস্যার কথা মাথায় রেখে এস্টিমেট্স কমিটি ও দ্বিতীয় বেতন কমিশন মন্ত্রকের কার্যালয় ও সংযুক্ত কার্যালয়ের সম্পূর্ণ একীকরণের সুপারিশ করে। এক্ষেত্রে একটি সাধারণ কার্যালয় সচিবালয়ের আধিকারিকদের এবং সংযুক্ত কার্যালয়ের আধিকারিকদের সাহায্য করবে, একটিমাত্র ফাইল ব্যুরোর মাধ্যমে কার্য সম্পাদিত হবে এবং এই করণিক বিভাগ উভয়কেই কাগজপত্র সরবরাহ করবে।

এর ফলে একদিকে যেমন - ব্যয়ভার লাঘব হবে, অন্যদিকে কাজে দ্রুত গতি আনা সম্ভব হবে।

ঘ) Bengal Administration Enquiry Committee (Rowlands) মন্ত্রক ও সংযুক্ত কার্যালয়ের পৃথক অস্তিত্বের সপক্ষে রায় দেয়, কিন্তু এই কমিটি সুপারিশ করে যে, একটিই ফাইল ও একটি ফাইল ব্যুরোর সাহায্যে উভয় দপ্তরের কাজই সম্পন্ন হ'লে কম সংখ্যায় কর্মী নিয়োগ করতে হবে এবং দ্রুত গতিতে যে কোনও কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

ঙ) সচিবালয় ও সঞ্চালক দপ্তরের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন না ক'রে সঞ্চালক প্রধানকে পদাধিকার বলে সচিবের মর্যাদা দেওয়া হ'লে, এই দুই কার্যালয় পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে উৎসাহ পাবে। যেমন - টেক্সটাইল কমিশনার পদাধিকার বলে বাণিজ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন। এর ফলে নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের সমন্বয় সাধন সহজতর হবে।

চ) সর্বভারতীয় আকাশবানীর সঞ্চালক সাধারণ ও তথ্য ও প্রচার মন্ত্রকের সম্পর্ক অপর একটি দিককে উন্মোচিত করে, যা কেবল দুরত্ব বৃদ্ধির সহায়ক। এই দুটি কার্যালয় সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে এবং স্বতন্ত্র নথি, কর্মী প্রভৃতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে। এমনকি এই দুটি দপ্তরের মধ্যে পরামর্শ ও সুপারিশের আদান প্রদান হয় মুখবন্ধ পত্রের মাধ্যমে।

এই ধরণের সম্পর্ক রক্ষার কয়েকটি সুবিধা লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন প্রস্তাবের পুণরীক্ষণ এর ফলে সম্ভব হয়। বিশেষজ্ঞের অতি-উৎসাহজাত প্রকল্পকে বাস্তবসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য হয় এবং নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের দায়িত্ব দু'টি ভিন্ন কার্যালয়ের হাতে থাকায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোও যথেষ্ট পীড়ার কারণ হতে পারে। একই কাজ বারংবার করার ফলে কার্য সম্পাদনে অহেতুক বিলম্ব হয়। বিশেষজ্ঞ যে প্রকল্পের সুপারিশ করেন তা সচিবালয়ের সহকারীর স্তরে প্রথম বিশ্লেষিত হয় এবং সহকারী মহোদয় যে মন্তব্য সহযোগে প্রস্তাবটিকে সচিবালয়ে প্রেরণ করেন, তা অনেক সময়েই মূল প্রস্তাবকে বিকৃত করতে সাহায্য করে এবং প্রস্তাবের উদ্দেশ্যটিও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সচিবালয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাকে বস্তুবাদী বলা হলেও অনেক সময়ই দেখা যায় তা অপরিণামদর্শী ও অজ্ঞানতার ফল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উন্নয়নের প্রশাসন যে প্রশাসনিক উন্নতি প্রত্যাশা করে, তার স্বার্থে সম্পূর্ণ একীকরণ বা সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কোনটাই কাম্য নয়। বিভিন্ন বিভাগের কর্মদায়িত্ব, কাজের গুরুত্ব প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ থাকায় একই ধরণের সম্পর্কের সূত্রে সমস্ত বিভাগের সচিবালয় ও সংযুক্ত কার্যালয়কে বাঁধা যাবে না। বিভাগীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দুই কার্যালয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে।

৫.৪ সারাংশ

সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত কার্যালয়কে যুক্ত করা হয় পরিচালনার মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে। সঞ্চালকের কাজের সীমানা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এর গুরুত্ব ও উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান কর্মভার কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দায়িত্ব বৃদ্ধি করায় সহায়ক সংস্থা হিসাবে সঞ্চালকের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সঞ্চালকের কারিগরী যোগ্যতা ও সচিবালয়ের সাধারণ বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান, কোনটির উপযোগিতা বেশী তা নিয়েও বর্তমানে যথেষ্ট মতদ্বৈততা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সঞ্চালকের সংখ্যা ও দায়িত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সচিবালয়ের পরামর্শ যেমন গুরুত্বের দাবী রাখে, তেমনি সঞ্চালকের প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত জ্ঞানও নীতি নির্ধারণে অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করে। অর্থ, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগে সঞ্চালকের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। অতঃপর সচিবালয় ও সঞ্চালক পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে এটাই কাম্য।

৫.৫ প্রশ্নমালা

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১) ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন / মধ্যবর্তী স্তরে সঞ্চালক দপ্তরের অবস্থান।

খ) কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশন / চেম্বার অফ কমার্স / ভারতীয় স্ট্যাটিউটারি কমিশন একটি সঞ্চালক দপ্তর।

গ) কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (CBI) ক্যাবিনেট সচিবালয় / প্রতিরক্ষা মন্ত্রক / বিদেশ মন্ত্রকের অধীন।

ঘ) বর্তমানে কমবেশী ৩৫/২১/৭০টি সঞ্চালক দপ্তর আছে।

২) **দুই / এক কথায় উত্তর দিন।**

ক) সচিবালয়ের অধীনে শাসনবিভাগীয় সংস্থাসমূহ কিভাবে বিন্যস্ত?

খ) সঞ্চালকের মুখ্য কাজ কি?

গ) সচিবালয় ও সঞ্চালকের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি?

ঘ) স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন দুটি সঞ্চালক কার্যালয়ের নাম লিখুন।

৩) **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)**

ক) কি উদ্দেশ্যে সঞ্চালক কার্যালয় গঠন করা হয়?

খ) বর্তমান প্রশাসনে সঞ্চালকের গুরুত্ব সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করুন।

৪) ১৫০ টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন

ক) সঞ্চালকের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখুন।

খ) সচিবালয় ও সঞ্চালকের সম্পর্ক সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৫.৬ উত্তর সংকেত

১) ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যবর্তী স্তরে সঞ্চালক দপ্তরের অবস্থান।

খ) কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশন একটি সঞ্চালক দপ্তর।

গ) কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (CBI) ক্যাবিনেট সচিবালয়ের অধীন।

ঘ) বর্তমানে কমবেশী ৭০টি সঞ্চালক দপ্তর আছে।

২) ক) প্রস্তাবনা — প্রথম অনুচ্ছেদ এস. আর. মহেশ্বরী বিভিন্ন স্তরে ..... বিভাগীয় কর্মদপ্তর .....ইত্যাদি।

খ) প্রস্তাবনা — দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ — প্রশাসন পরিচালনার মধ্যবর্তী স্তরে .....দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গ) *সচিবালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে। সঞ্চালক প্রশাসনের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করে।
*সচিবালয় সাধারণ প্রশাসনে বিশেষজ্ঞ। সঞ্চালক কৌশলগত বিশেষজ্ঞ।

ঘ) কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশের ডাইরেক্টরি জেনারেল ও গোয়েন্দা বিভাগ।

৩) ক) ৫.২ — প্রথম অনুচ্ছেদ — প্রশাসনিক কাঠামোর ..... গড়ে তোলা হয়।

প্রস্তাবনা - শেষ অনুচ্ছেদ - মধ্যবর্তী স্তরে যে সংযুক্ত.....

খ) ৫.৩ — দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৪) ক) ৫.২ এবং প্রস্তাবনা শেষ অনুচ্ছেদের শেষ অংশ।

খ) ৫.৩

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) Maheshwari, S. R., *Indian Administration*, (5th ed.) New Delhi, Orient Longman, 1995, P.131.

২) Report of the Commission of Enquiry on Emoluments and Conditions of Service of Central Government Employees, 1957-59, New Delhi, Ministry of Finance, 1959, P.126, referred from Maheshwari S.R., P.132.

৩) Arora, Ramesh K., Goyal, Rajni, *Indian Public Administration*, (2nd ed.), Delhi, Wishwa Prakashan, 1997, P.151

৪) Maheshwari, S. R., *op cit.*, P. 133- 6

৫) *ibid.*, 139

সামগ্রিক প্রশ্নাবলি : Broad Questions - ১৫০ শব্দের মধ্যে

১) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। (উঃ দ্বিতীয় অধ্যায়)

২) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কিভাবে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের কাজকর্ম প্রভাবিত করে? (উঃ দ্বিতীয় অধ্যায়)

৩) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের বিন্যাস ও দায়িত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। (উঃ তৃতীয় অধ্যায়)

৪) তুমি কি মনে কর যে, নীতি প্রয়োগের পরিবর্তে নীতি নির্ধারণের কাজেই কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের আরো মনযোগী হওয়া প্রয়োজন? যুক্তি সহকারে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা কর।

৫) ক্যাবিনেট সচিবের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। (উঃ তৃতীয় অধ্যায়)

৬) ভারতে ক্যাবিনেট সচিবালয়ের ভূমিকা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। (উঃ তৃতীয় অধ্যায়)

৭) ভারতীয় প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রকৃতি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখ। কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তুমি কি মনে কর? যুক্তি সহকারে তোমার বক্তব্য পেশ কর। (উঃ প্রথম অধ্যায়)

৮) জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারের ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রশাসনের প্রচলিত কাঠামো কতটা বাস্তবোচিত তা যুক্তি সহকারে উল্লেখ করুন।

৯) সঞ্চালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ সহকারে সচিবালয় ও সঞ্চালকের সম্পর্কটি পরিস্ফুট কর।

সংযুক্ত কার্যালয়ের উপযোগীতা সম্বন্ধে একটি সমালোচনামূলক টীকা লেখ।

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১) ভারত সরকারের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠিত হয়

ক) ১৮৪৩

খ) ১৮৩৩

গ) ১৯২১

ঘ) ১৮১৩

২) কোন সচিবালয় সরকারী কার্যবিধি প্রস্তুত করে ও বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে?

ক) প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর

খ) ক্যাবিনেট সচিবালয়

গ) কেন্দ্রীয় সচিবালয়

ঘ) সংসদীয় সচিবালয়

৩) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন ক্যাবিনেট সচিবের জন্য কত বছরের কার্যকাল সুপারিশ করেছে?

১) ক) ৫ - ৬ বছর

খ) ৪ - ৫ বছর

গ) ১ - ২ বছর

ঘ) ৩ - ৪ বছর

৪) ১৯৫০ থেকে রাষ্ট্রকৃত্যক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন —

ক) প্রতিরক্ষা সচিব

খ) স্বরাষ্ট্র সচিব

গ) ক্যাবিনেট সচিব

ঘ) অর্থসচিব

৫) ক্যাবিনেট মিটিং-এ উপস্থিত থাকা ও আলোচিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে রেকর্ড সংরক্ষণ ও বিভিন্ন মন্ত্রককে প্রেরণ কার দায়িত্ব?

ক) ক্যাবিনেট সচিব

খ) উপ সচিব

গ) অতিরিক্ত সচিব

ঘ) যুগ্ম সচিব

৬) মুখ্য সচিবদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব কে করেন?

ক) ক্যাবিনেট সচিব

খ) উপ সচিব

গ) যুগ্ম সচিব

ঘ) অতিরিক্ত সচিব

৭) প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় কোন সময় থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হিসাবে পরিচিত হয়?

ক) ১৯৮৫

খ) ১৯৬২

গ) ১৯৭৭

ঘ) ১৯৭৯

৮) সাধারণভাবে সচিবালয়ের কাজ কি?

ক) নীতি নির্ধারণ

খ) আইনের খসড়া প্রস্তুত

গ) নীতি প্রয়োগ

ঘ) ওপরের তিনটি কাজ

৯) ক্যাবিনেট সচিবালয়ের প্রধান কে?

ক) রাষ্ট্রপতি গ) ক্যাবিনেট সচিব

খ) প্রধানমন্ত্রী ঘ) সিনিয়র ক্যাবিনেট মন্ত্রী

১০) সংযুক্ত কার্যালয়ের প্রধান কাজ কি?

ক) নীতি নির্ধারণ

খ) নীতি প্রয়োগ

গ) নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৌশলগত জ্ঞান ও তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দান

ঘ) সরকারী নথি সংরক্ষণ।

Short Answer type সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

১) কেন্দ্রীয় সরকারের স্নায়ুকেন্দ্র কাকে বলা হয়? কেন? (উঃ কেন্দ্রীয় সচিবালয়, উত্তরের বাকী অংশ — কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ভূমিকা)

২) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কোন বিভাগের সচিব সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন? (উঃ স্বরাষ্ট্র সচিব — আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য উন্নয়নের প্রশ্ন জড়িত — ইত্যাদি)

৩) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের গঠন বর্ণনা করুন।

৪) ক্যাবিনেট সচিবের পদটি সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন কেন? (উঃ প্রধানমন্ত্রী, ক্যাবিনেট ও ক্যাবিনেট কমিটির পরামর্শদাতা, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ইত্যাদি)

৫) প্রধানমন্ত্রীর 'চোখ ও কান' কাকে বলে? (উঃ ক্যাবিনেট সচিব — প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতা ও সহায়ক)

৬) ক্যাবিনেট সচিবালয়ের গঠন বর্ণনা কর।

৭) সঞ্চালক ও সচিবালয়ের মধ্যে বিরোধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। (উঃ চতুর্থ অধ্যায়; শেষাংশ)

৮) কয়েকটি সংযুক্ত কার্যালয়ের উদাহরণ দাও। এদের বিশেষজ্ঞ সংস্থা বলা হয় কেন?

৯) 'প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর' কিরূপে সজ্জিত?

১০) টীকা লিখুন

ক) প্রশাসনের সঞ্চালন শক্তি

খ) আমলা বনাম প্রযুক্তিবিদ

গ) ক্যাবিনেট কমিটি ব্যবস্থা

ঘ) যুগ্ম সচিব

ঙ) অতিরিক্ত সচিব

চ) সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতিভান্ডার (কেন্দ্রীয় সচিবালয়)

ছ) কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

জ) নিরাপত্তা সচিব

ঝ) সমন্বয় সচিব

ঞ) RAW

একক 1 ❑ রাজ্য সচিবালয়ের সংগঠন ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগ

গঠন

1.0 উদ্দেশ্য

1.1 প্রস্তাবনা

1.2 ভূমিকা

1.3 সচিবালয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

1.4 রাজ্য সচিবালয়ের গুরুত্ব

1.5 রাজ্য সচিবালয়ের গঠন

1.6 রাজ্য সচিবালয়ের কাজ ও ভূমিকা

1.7 রাজ্য সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের সম্পর্ক

1.8 সারাংশে

1.9 অনুশীলনী

1.10 উত্তর সংকেত

1.11 গ্রন্থপঞ্জি

1.0 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে—

- রাজ্যে প্রশাসনিক কার্য নির্বাহে সচিবালয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে জানা যাবে।
- রাজ্য প্রশাসনিক গঠন কাঠামো সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব হবে।
- সচিবালয়কে দায়িত্ব নির্বাহে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা জানা যাবে।
- সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যাবে।
- রাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতিও পরিচালন সংক্রান্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে।

1.1 প্রস্তাবনা

সাংগঠনিক কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্লেষণ করলে ভারতবর্ষকে যুক্তরাষ্ট্র বলা যেতে পারে। কেন্দ্র ও রাজ্যে আপাত দৃষ্টিতে সমান্তরাল প্রশাসন কাঠামোর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সরকার, কার্যধারা ও কর্মীবৃন্দ নিয়ে প্রধানত এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামোটি গঠিত হয়। সহযোগিতা ও সমন্বয়, বিরোধ ও জটিলতা নিয়েই এই প্রশাসনিক কাঠামো জনকল্যাণের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এই প্রশাসনিক কাঠামো সুস্পষ্ট আকৃতি গ্রহণ করেছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। 1919 ও 1935 সালের পর ভারতে প্রশাসনিক সংস্কার গতি

পায় এবং স্বাধীনতার পরেও বিশেষত সচিবালয় গঠনে ব্রিটিশ প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। ব্রিটিশ ICS সচিবদের প্রভাব প্রতিপত্তির ধারা বর্তমান সচিবদের মধ্যেও সংক্রামিত হওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতা অনেক সময়েই তীব্র হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বভারতীয় কৃত্যকদের রাজ্য প্রশাসনে প্রভাব বৃদ্ধির অযুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা। এই সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে নিম্নলিখিত এককটি পাঠ করা আবশ্যক।

1.2 ভূমিকা

ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকরী ও দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। তথ্য সংগ্রহ, জনসংযোগ রক্ষা থেকে শুরু করে শাসনতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়েই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নির্ভর করতে হয় বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মীদের কর্মদক্ষতার ওপর। প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্র, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, আইন ও নিরাপত্তা রক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ও প্রশাসনিক জটিলতা যত তীব্র হয়ে উঠছে, ততই দেশ গঠনের কাজে গুরুত্ব বাড়ছে প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দের। সাইবারনেটিক রাষ্ট্র ও বৈদ্যুতিন (e-governance) সরকারের ধারণা যতই আমলাতন্ত্রের সংকীর্ণায়নের (Debureaucratisation) কথা বলুক, এক শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মী শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অপরিহার্য থেকে গেছে এবং তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা এই কর্মীদের ওপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নির্ভরতা বৃদ্ধি করেছে।

1.3 সচিবালয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় জনপ্রশাসন কাঠামোর এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সচিবালয়। মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্র কৃত্যকের মধ্যবর্তী স্তরে এই সচিবালয়ের অবস্থান। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্য মন্ত্রীগণ এবং রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সহায়ক মন্ত্রীমণ্ডলী রাজনৈতিক ভাবে নির্বাচিত হন। এই সকল ব্যক্তিগণ সুচতুর রাজনীতিবিদ্ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষ প্রশাসক নন এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও কৌশলগত খুঁটিনাটিতে এঁরা যথেষ্ট পারঙ্গম নন। পাঁচ বছর পড়ে এঁদের পুনরায় জনগণের রায়ের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, ফলে অস্থায়ীত্ব এঁদের অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতার অবসান করতে দেয় না। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, নির্বাচনে জয়লাভের পরের ছয় মাস চলে যায় আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রচারে; নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির প্রকৃতি ও সারমর্ম, তার বাস্তবতা ও শূণ্যতা উপলব্ধি করতে করতেই চলে যায় সম্ভবত আরো এক বছর, শেষ এক থেকে দেড় বছর বোধ হয় পরের নির্বাচনের প্রস্তুতিতে কাজে লাগে। মধ্যবর্তী বছর দুয়েক প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়, ফলে পরামর্শদাতা হিসেবে সচিবালয়ের ওপর নির্ভরতা বাড়তেই থাকে।

1.4 রাজ্য সচিবালয়ের গুরুত্ব

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অনুরূপ রাজ্য প্রশাসনেও সচিবালয় একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়। রাজ্য সরকাররের প্রশাসন পরিচালনায় রাজ্য সচিবালয়ের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রশাসনিক

কাঠামোর উপরের স্তরে এই সচিবালয়ের অবস্থান। সচিবগণ সরকারের সচিব বলে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মন্ত্রকের নিজস্ব সচিব থাকে, যাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে শাসনকার্য নির্বাহে সহায়তা করেন। সচিবালয় বলতে বিভিন্ন মন্ত্রকের সচিবদের একত্রীকৃত একটি সংগঠনকে বোঝায়। প্রত্যেক মন্ত্রীর অধীনে যে পেশাদারী জন কৃত্যক নির্বাহী পরামর্শ দাতা থাকেন তাঁরা সচিব নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ একত্রে সচিবালয় গঠন করেন। 'The expression 'Secretariat' is used to refer to the complex of departments whose political heads are ministers while the administrative heads are Secretaries to the Government (Arora, Goyal, P. 228-9) অর্থাৎ মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক প্রধান যদি মন্ত্রী হন, তবে প্রশাসনিক প্রধান হলেন সরকারের সচিব, যিনি রাজনৈতিক প্রধানের নির্দেশ কার্যে রূপায়িত করেন, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে মন্ত্রীকে নীতি নির্ধারণে ও শাসন পরিচালনায় সাহায্য করেন এবং অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে মন্ত্রীকে তাঁর দায়িত্ব নির্বাহে সহযোগিতা করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রী তাঁর বিভাগীয় কাজকর্মের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা ও তার বিভিন্ন কমিটিগুলি মন্ত্রীদের কাজের হিসাব নেয় ও নানান প্রশ্নের মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করে; সচিবালয় এক্ষেত্রে মন্ত্রীগণকে তথ্য সরবরাহ করে ও উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করে। সরকারের কার্যনির্বাহী প্রশাসনিক দপ্তরগুলিও সংশ্লিষ্ট সচিবদের ওপর নির্ভরশীল ও অধীনস্থ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সচিবালয় ও প্রশাসনিক দপ্তর দুটি পৃথক সত্তার পরিচিতি বহন করে। প্রশাসনিক বিভাগ সরকারের কার্যনির্বাহী সংস্থা, যার দায়িত্বে থাকেন বিভাগীয় প্রধান এবং এই বিভাগীয় প্রধান উক্ত দপ্তরের সচিবের অধীন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা বিভাগীয় প্রধান, যিনি নির্ভর করেন শিক্ষা সচিবের ওপর। তবে সকল বিভাগেই সচিবের অধীনস্থ প্রশাসনিক কার্যনিবাহী বিভাগ নেই, এ সকল ক্ষেত্রে সচিব পরামর্শদাতা ও কখনও কখনও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় কাজ করে থাকেন।

1.5 রাজ্য সচিবালয়ের গঠন

সচিব বলতে সমগ্র সরকারের সচিবকে বোঝালেও প্রত্যেক বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে সচিব থাকেন, তবে বিভাগের সংখ্যা সচিব সংখ্যা থেকে অধিক হতে পারে, কারণ অনেক সময় একাধিক বিভাগের দায়িত্ব একজন সচিবের হাতে দেওয়া হতে পারে বলে এস. আর মহেশ্বরী তাঁর ইন্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (Pg. 519) বইতে উল্লেখ করেছেন।

একটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে দায়িত্বে থাকেন সচিব। তার পরবর্তী স্তরগুলিতে থাকেন উপসচিব, অধস্তন সচিব এবং/অথবা সহকারী সচিব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃহৎ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবও থাকতে পারেন। সকলেই স্থায়ী কার্যকাল ও সুনির্দিষ্ট শর্তে সচিব হিসাবে কাজে যোগদান করেন।

রাজ্য বিশেষে সচিব সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। তবে সাধারণত সাধারণ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব, খাদ্য ও কৃষি, পরিকল্পনা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, অর্থ, আইন, পূর্ত, সেচ ও শক্তি, শিক্ষা, সমবায়, পরিবহন, স্থানীয় শাসন, জেল, শ্রম ও নিয়োগ, কর ও শুল্ক ইত্যাদি বিভাগের নিজস্ব সচিবালয় থাকে।

1.6 রাজ্য সচিবালয়ের কাজ ও ভূমিকা

- রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নিকটতম অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত সচিবালয় রাজ্য সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আধার বলে বিবেচিত হয়। ব্যক্তিগত ও যৌথ কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণকে নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে এই সচিবালয়।
- রাজ্য সরকারের চিন্তকগোষ্ঠী (Think Tank) এবং 'ব্রেন-ট্রাস্ট' হল এই সচিবালয়। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিন্যাস, গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার (Prioritisation) নির্ধারণ এবং যথাস্থানে নির্দেশ প্রেরণ সচিবালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- রাজ্য প্রশাসনের সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে সচিবালয়ের গুরুত্ব উল্লেখের দাবি রাখে। পরিকল্পনা, অর্থ, কর্মী ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ প্রশাসনিক দপ্তরের সচিবালয়গুলি মুখ্যত এই ধরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।
- প্রশাসনিক অধিকর্তা (Directorate) এবং ক্ষেত্র সংগঠনগুলিকে (field organisation) সরকারি নীতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করে রাজ্য সচিবালয়।

  বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা তৈরি, পরামর্শ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মনীতি নির্দিষ্টকরণ এবং এই সংস্থাগুলির কাজের মূল্যায়নের জন্য সরকারকে সাহায্য করা সচিবালয় স্বীয় দায়িত্ব হিসাবে পালন করে থাকে।
- আইনের খসড়া প্রস্তুত, কার্য পরিচালনার জন্য নিয়মনীতি নির্ধারণ, কর্মপদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বিধি স্থির করা রাজ্য সচিবালয়ের কাজ। এই অর্থে রাজ্য সচিবালয় আধা-আইন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে থাকে।
- রাজ্য সচিবালয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্য রাজ্যের সরকারকে প্রয়োজনে এই সচিবালয়ের সঙ্গেই প্রথম যোগাযোগ করতে হয়।

বিশেষ দায়িত্ব

আনুষ্ঠানিক এই সকল দায়িত্ব ছাড়াও সচিবালয়কে প্রশাসন সংক্রান্ত নানান কাজ করতে হয়। রাজ্য সরকার রাজ্য শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যে কোনও ধরনের কাজের দায়িত্ব সচিবালয়কে দিতে পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে এই দায়িত্বগুলি বিভিন্ন ধরণের হয়। উল্লেখ্য যে, সাধারণ প্রশাসন, অর্থনীতি ও অন্যান্য পরিষেবা সম্বন্ধিত নানান কাজে সচিবালয় রাজ্য সরকারকে সাহায্য করে, যা সকল রাজ্যের ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য।

সাধারণ প্রশাসন সম্বন্ধীত দায়িত্ব

(ক) সাধারণ নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি রাজ্য সচিবালয়ের কর্মপরিধির মধ্যে পড়ে।

(খ) আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় সাধন রাজ্য সচিবালয়ের অন্যতম দায়িত্ব।

(গ) প্রচলিত বা প্রস্তাবিত আইন ও রীতির সংশোধন বা প্রণয়নের জন্য খসড়া প্রস্তুত, ব্যাখ্যা অথবা আইন ও রীতির কঠোরতা শিথিল করার প্রয়াস রাজ্য সচিবালয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার, অন্যান্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজ্য সচিবালয়।

(ঙ) রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য নতুন পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত অথবা পুরানো পরিকল্পনার সময়োপযোগী পরিবর্তনের শর্ত নির্ধারণ সচিবালয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

(চ) পরিকল্পিত প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন।

(ছ) বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক পরিদর্শকের প্রতিবেদন ও ভ্রমণ বিষয়ক রিপোর্টের সংরক্ষণ করে সচিবালয়।

(জ) জাতীয় ও রাজ্যস্তরে সম্মেলনের আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে সচিবালয়।

(ঝ) সরকারি গাণিতিক কমিটি, আনুমানিক ব্যয় কমিটি ও রাজ্য বিধানসভায় রাজ্য সরকারের তরফে প্রতিনিধিত্ব ও উত্থাপিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা সচিবালয়ের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

(ঞ) রাজ্য সীমানাভুক্ত প্রশাসনিক একক ও প্রধান কার্যালয়ের কাজের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনে পরিবর্তন রাজ্য সচিবালয়ের অন্যতম কাজ।

(ট) রাজ্য সরকারের পক্ষে মামলার বিজ্ঞপ্তি জারী, আবেদন, সংশোধন থেকে শুরু করে প্রয়োজনে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ পর্যন্ত কাজের দায়িত্ব সচিবালয় বহন করে।

অর্থনৈতিক দায়িত্ব

(ক) বিভাগীয় বাজেট প্রস্তাবের বিশ্লেষণ ও অনুমোদন, তহবিল সমর্পণ, অতিরিক্ত অনুদান প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্য সচিবালয়। বাজেট পেশে মন্ত্রীকে সাহায্য করে সচিবালয়।

(খ) নতুন কোনো খাতে ব্যয় প্রস্তাব করতে পারে রাজ্য সচিবালয়।

(গ) বিভাগীয় প্রধানদের এক্তিয়ার বহির্ভূত বিষয়াদিতে অর্থ অনুমোদন করে রাজ্য সচিবালয়।

(ঘ) আকস্মিক ব্যয় তহবিল এবং সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন করে রাজ্য সচিবালয়।

(ঙ) অডিট রিপোর্টে বেহিসাবের খতিয়ান গুটিয়ে আনতে পারে অথবা অবলুপ্ত করতে পারে একমাত্র রাজ্য সচিবালয়। বিভাগীয় হিসাবে গরমিল দেখা দিলে তার তদন্ত করে থাকে রাজ্য সচিবালয়, বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রধানের এই ক্ষেত্রে কোনও ক্ষমতা নেই।

পরিষেবা সংক্রান্ত দায়িত্ব

(ক) চাকরির নিয়মাবলি ও শর্তাদির অনুমোদন ও সংশোধন।

(খ) উচ্চপদস্থ সরকারি অধিকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি ও শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে শাস্তির সুপারিশ করে সচিবালয়।

(গ) রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টি, পুনর্নিয়োগ, অবসর, বিশেষ বেতন ও ভাতা, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার সুপারিশ করে রাজ্য সচিবালয়।

উদ্ভূত সমস্যাদি

উপরিউক্ত প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েই রাজ্য সচিবালয়কে কাজ করতে হয়। গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়াদি সর্ব অবস্থাতেই মন্ত্রীর নজরে আনতে সচিবালয় বাধ্য থাকে। রাজ্য সচিবালয়ের

কাজের সীমা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য না হলেও অনেক সময়ে দেখা গেছে যে রাজ্য সচিবালয়ের ক্ষমতার দম্ভ চূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকার বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রধানদের সাহায্য নিয়েছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে ইদানীংকালে সচিবালয়ের ওপর অনভিজ্ঞ মন্ত্রীদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে প্রশাসনিক কার্য নির্বাহে স্ববিরোধ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই অনিশ্চয়তা আপাত দৃষ্টিতে না থাকলেও দলীয় রাজনীতির চাপ অনেক সময়েই সচিবালয়ের কর্মদক্ষতা হ্রাস করেছে, যার প্রভাব পড়েছে সার্বিকভাবে রাজ্য প্রশাসনের ওপর। একথা কারোরই অজানা নয় যে, সচিবরা একটি উচ্চবিত্ত বা কমপক্ষে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক কৌলীন্য তাঁদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আশি শতাংশ মানুষেরই দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। একদিকে জনকল্যাণের চাহিদা ও অন্যদিকে সচিব নির্ভরতা প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্বাহে দ্বন্দ্বের অবকাশ তৈরি করেছে। সচিব নির্ভর রাজ্য সরকারগুলি সাধারণ মানুষের সমস্যার গভীরে পৌঁছতে পারছে না ও সচিবদের ব্যক্তিগত শ্রেণিস্বার্থ সরকারের পরিকল্পনা, নীতি, বাজেট প্রভৃতি এমনভাবে প্রভাবিত করছে যে, সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সরকারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এবং ভারতের অপরিণত যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র নিত্য নতুন সংকটের মধ্যে পড়ছে।

প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ

এই সমস্যা সত্ত্বেও কেন্দ্রের মতো রাজ্য প্রশাসন পরিচালনায়ও সচিবালয়ের অপরিহার্যতা প্রশ্নাতীত। এস. আর. মহেশ্বরী যথার্থই সচিবালয়কে সরকারের স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve Centre) বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ তাঁর মতে সচিবালয়ের মাধ্যমেই প্রশাসনের নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। সচিবালয়ের কাজের ব্যাপকতার ওপর নির্ভর করে প্রধান সচিবের অধীনে বিশেষ সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সহকারী সচিব নিয়োগ করা হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে বিন্যাস নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের গুরুত্ব ও কর্মভারের ওপর। বেশির ভাগ রাজ্যেই সাধারণ প্রশাসন, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব, ভূমি সংস্কার, শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ, পরিকল্পনা, পুনর্বাসন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিভাগীয় সচিবালয় ছাড়া ক্যাবিনেট সচিবালয় ও মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় আছে। রাজ্য বিশেষে এর সংখ্যা ভিন্নতর হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে উক্ত বিভাগগুলি ছাড়াও পঞ্চায়েত, সেচ, ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, পরিবহন, কারা, বিচার ও আইন প্রভৃতি বিভাগের সচিবালয় আছে। পশ্চিমবঙ্গের এই সচিবালয়গুলি সরকারের সঙ্গে একযোগে ভূমি সংস্কার, সাক্ষরতা, কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উন্নয়ন, শ্রমক্ষেত্রে কর্মচারী বিমা ও স্বনিযুক্তি প্রকল্প, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীকল্যাণ, পরিবেশ দূষণ রোধ প্রভৃতি বিষয়ে সাফল্যের দাবী করতে পারে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা সব রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও গণতান্ত্রিক প্রশাসনকে সংকটের মধ্যে ফেলেছে। সস্তা জনপ্রিয়তায় মোহাবিষ্ট হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও সরকারের ওপর অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করে প্রশাসনিক দক্ষতা ক্ষুণ্ণ করেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সরকার সদিচ্ছা সত্ত্বেও সচিবালয়ের বিশেষ যোগ্যতা ও জ্ঞানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেনি এবং রাজ্য প্রশাসন ও অর্থনীতিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যান্য সমস্যা

প্রতিনিয়ত সরকার পরিবর্তনের ধাক্কা সচিবালয়কে অন্যান্য রাজ্যে কম সমস্যার মধ্যে ফেলেনি। নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে সরকারি কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করায় সমস্যার সৃষ্টি করে। নতুন নীতি ও মতাদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সচিবালয়ের পক্ষে যথেষ্ট জটিল হয়ে উঠতে পারে।

কায়েমি স্বার্থ, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদি রোধ করার জন্য বদলি নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ক্রমাগত রাজ্য ও কেন্দ্র সচিবালয়ে চলাচল বা আন্তঃবিভাগীয় বদলি কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে ঐকান্তিক যোগাযোগ স্থাপন করতে দেয় না। কাজে আন্তরিকতা কমে যায় এবং অভিজ্ঞতার অভাব সৃষ্টি করে। কিছু ক্ষেত্রে বদলি নীতি চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় সচিবদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় এবং কাজে শ্লথগতি আসে।

1.7 রাজ্য সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনিবাহী বিভাগের সম্পর্ক

সচিবালয় অনেক সময় অত্যন্ত কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠায় বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রধানদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মন্ত্রী, সচিব ও প্রশাসনিক বিভাগের এলাকা ও সম্পর্ক সুসঞ্চারিত না হওয়ায় সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত অর্থে মন্ত্রী জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করেন, সচিবালয় মন্ত্রকের মস্তিষ্ক হিসাবে কাজ করে এবং প্রশাসনিক কার্যনিবাহী বিভাগ সরকারি নীতিকে কার্যে রূপান্তরিত করে। 'But this ideal is followed more in its breach than in its practice'. (Arora, Goyal, p. 237) তবে অধিকাংশ সময়ই এই নিয়ম ভঙ্গ করার মাধ্যমেই নিয়মের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব

এই বিরোধের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রধানদের কর্মপরিধি ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার দরকার। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকেরই সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগ থাকে, যা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ক্ষেত্রগত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই প্রশাসনিক কার্যনিবাহী বিভাগ পশ্চিমবঙ্গে 'Directorate' বা প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগ বা সঞ্চালক দপ্তর নামে পরিচিত এবং এই দপ্তরের প্রধানকে অধিকর্তা বা 'Director' বলা হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে এই কার্যনির্বাহী বিভাগ সংযুক্ত কার্যালয় (Attached office) হিসেবে পরিগণিত হয়। সচিবালয় নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে এবং প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগ নীতি প্রয়োগের কাজে নিযুক্ত থাকে। দ্বিতীয় এই বিভাগটি বাজেটের খসড়া প্রস্তুত, বাৎসরিক কাজের প্রতিবেদন পেশ, মন্ত্রীর কৌশলগত উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা, বিভাগীয় কাজের খতিয়ান বিশ্লেষণ, সরকারি নীতির প্রয়োগ, পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কর্মসূচি প্রস্তুত, বিভাগীয় কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সুযোগ-সুবিধা, ছুটির হিসাব প্রভৃতি কর্মী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, দপ্তরে শৃঙ্খলা রক্ষা ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, জেলাস্তরের কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা প্রভৃতি অর্থাৎ, তত্ত্বগতভাবে প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের কাজ হল ব্যাপক, পক্ষান্তরে রাজ্য সচিবালয়ের কাজ সুনির্দিষ্ট ও ভিন্ন ধরণের।

রাজ্য সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী সঞ্চালক দপ্তরের মধ্যে যোগসূত্র

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, সচিবালয় একটি নীতি প্রণয়নকারী সংস্থা এবং সঞ্চালক দপ্তর একটি কার্যনির্বাহী সংস্থা। কোনও একটি বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত সঞ্চালক দপ্তর (Directorate) এর নেতৃত্বে থাকেন

অধিকর্তা। পৌরনিগম বিভাগের রাজনৈতিক প্রধান যদি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী হন, তাহলে এর প্রশাসনিক প্রধান হলেন সর্বভারতীয় কৃত্যক সদস্য সংশ্লিষ্ট সচিব। পৌরপ্রশাসনের সঞ্চালক দপ্তর প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত ক্ষেত্রস্তরের কাজ ও সমস্যার তদারকি করে। এই কাজে প্রধান অধিকর্তাকে সহযোগিতা করেন যুগ্ম বা সহকারি অধিকর্তা। ক্ষেত্রস্তরের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগ সচিবালয়কে যে তথ্য সরবরাহ করে, তা সচিবালয়কে নতুন নীতি প্রণয়নে ও পূর্বতন নীতির সংশোধনে সাহায্য করে, এছাড়া অনুদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও বাজেট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতেও এই তথ্যাদি সাহায্য করে। জনশিক্ষা অধিকর্তা (D. P. I.) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে যেভাবে ক্ষেত্রগত তথ্য দিয়ে নীতি গ্রহণে সহযোগিতা করেন, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ

অতঃপর একথা সহজেই প্রণিধানযোগ্য যে সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনিবাহী বিভাগ দুটি পৃথক সংস্থা হলেও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তাদের কাজ করতে হয়। প্রশাসনিক কার্যনিবাহী বিভাগ প্রকৃতপক্ষে একটি কৌশলগত বিশেষজ্ঞ সংস্থা, যা প্রধানত তদারকি ও পরামর্শ দানের কাজ করে থাকে। সচিবালয় অনেক সময় অত্যুৎসাহী হয়ে ক্ষেত্রস্তরের কাজে হস্তক্ষেপ করে এই বিভাগের কাজের এলাকায় প্রবেশ করে। Directorate of Local Bodies নামক একটি সঞ্চালক দপ্তর পশ্চিমবঙ্গে 1978 সালে কাজ শুরু করে। পৌর সংস্থাগুলির কাজের তদারকি করা, তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, তাদের বাজেট বিশ্লেষণ করা, তহবিলের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত সুপারিশ করা DLB এর প্রধান কাজের মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় দপ্তরটি ছাড়াও সহকারী অধিকর্তাদের অধীনে তিনটি বিভাগীয় দপ্তর তথা বিধাননগর, বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি দপ্তরের সাহায্যে DLB কাজ করে থাকে। এই বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পৌর প্রশাসনে গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল। বিভাগীয় দপ্তরগুলি পরিসংখ্যান ও তথ্য সরবরাহ করে এবং এর কেন্দ্রীয় দপ্তরে তথ্যাদির বিশ্লেষণ হয় এবং তা সচিবালয়ে প্রেরিত হয় পরবর্তী নীতি ও আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের জন্য। 'Thus the directorate and the secretariat have to work in concert to ensure headquarter's coordinating role and the directorate's duty to keep track of field situation'. (Bhattacharya, Mohit, p. 67). অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সমন্বয়কারী ভূমিকা তখনই সফল হয় যখন সচিবালয় এবং কার্যনির্বাহী বিভাগ মিলেমিশে কাজ করে। কিন্তু তত্ত্বগত এই প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবের তারতম্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। ক্ষেত্রগত কাজেও সচিবালয়ের অতি সক্রিয়তা কৌশলগত দক্ষতা হ্রাস করে চলেছে, ফলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি অর্থসংগ্রহে বিফল, প্রাপ্ত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহারে অপারগ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে অসমর্থ। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের অর্থ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কর্মসংস্কৃতি ফেরানোর তাগিদে বিশেষজ্ঞ পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সমস্যার অন্যরূপটি হল আরো জটিল, যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজ্য প্রশাসনের ওপর প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনের (1969) মাধ্যমে। এই প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সচিবালয়ের পদমর্যাদা বেশি হওয়ায় প্রশাসনিক অধিকর্তাদের সচিবালয়ে স্থান পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা লক্ষ করা যায়। সচিবালয়ে স্থান পেলে রাজ্যের রাজধানীতেই থাকা যায়, ক্ষেত্রের (field) উদ্বেগ ও কাজের চাপ থাকে না এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে

নিত্য যোগাযোগ পদোন্নতির পথ সুগম করে। সচিবালয়কে এস. আর. মহেশ্বরী Charmed Chamber 'আকর্ষক কক্ষ' বলে অভিহিত (Maheswari, P. 61) করেছেন।

সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের মধ্যে এই টানাপোড়েনের ফলে 'অতিশাসনের' প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। রাজ্য সরকারের কর্মপরিধি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে সচিবালয়ের কর্তৃত্বের পরিধি। সিদ্ধান্তগ্রহীতা হিসাবে কর্তৃত্ব ফলানোর মোহ অতিশাসন জনিত সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সচিবালয়ের কাজের এলাকা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা গেলে উক্ত সমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভব হতে পারে।

1.8 সারাংশ

স্বাধীন ভারতের জনপ্রশাসন জাতিগঠনের যে সুমহান কর্তব্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল, তা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশাসনের কর্মভার, দায়িত্ব ও কাজের জটিলতা বৃদ্ধি করেছিল, অতঃপর প্রয়োজন হয়েছিল (Line) কার্যধারা বিভাগ হিসাবে সচিবালয়ের এবং কর্মীবৃন্দ সংস্থা (staff) হিসাবে প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের। সচিবালয় নীতিগ্রহণ, সমন্বয়সাধন, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা, পরিকল্পনা গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগ নীতি প্রয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে এবং ক্ষেত্রগত প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে। সচিবালয় সাধারণ (generalist) প্রশাসকদের দ্বারা সমৃদ্ধ এতে ব্যতিক্রম হিসাবে চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে সচিব প্রধান করা হয়। সমবায়িক সমিতির রেজিস্ট্রার বিভাগীয় অধিকর্তা হলেও একজন সাধারণ প্রশাসক এবং প্রশাসনিক কার্যনির্বহী বিভাগ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা (specialist) সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় এই বিভাগটির পরামর্শ সচিবালয়কে এবং সরকারকে নীতি গ্রহণে ও প্রশাসন পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। এই দুটি বিভাগ পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করলে প্রশাসনিক দক্ষতা নিশ্চিত ভাবেই বৃদ্ধি পাবে।

1.9 অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন। (উত্তর সংকেত 17 পৃষ্ঠায়)

(ক) রাজ্য প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগের সচিব আছেন, যিনি—
   1. সর্বভারতীয় কৃত্যক সদস্য,
   2. আঞ্চলিক কৃত্যকের সদস্য,
   3. কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সদস্য,
   4. উপরিউক্ত কোনটিই নয়।

(খ) রাজ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা—
   1. বিশেষ সচিব,
   2. সমগ্র সরকারের সচিব,
   3. যুগ্ম সচিব,
   4. সহকারী সচিব।

(গ) রাজ্য সচিবালয়—
1. রাজ্য মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত
2. কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত
3. রাজ্যপালের অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত
4. কোনটিই সঠিক নয়।

(ঘ) রাজ্য সরকারের চিন্তক-গোষ্ঠী বলা হয়—
1. রাজ্য মন্ত্রীপরিষদকে
2. রাজ্য সচিবালয়কে
3. প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী অধিকর্তাগণকে।

(ঙ) জনশিক্ষা অধিকর্তা (DPI)—
1. রাজ্য সচিবালয়ের সচিব
2. প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী অধিকর্তা
3. কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সদস্য
4. কোনটিই নয়।

2. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন—
(ক) রাজ্য সরকারের 'ব্রেন ট্রাস্ট' হিসাবে সচিবালয়কে চিহ্নিত করা হয় কেন?
(খ) DLB কবে পশ্চিমবঙ্গে কাজ শুরু করে এবং DLB এর বিভাগীয় দপ্তরগুলি কোথায় অবস্থিত?
(গ) পশ্চিমবঙ্গে সচিবালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের উল্লেখ করুন।
(ঘ) সংযুক্ত কার্যালয় কোন প্রশাসনের অঙ্গ?
(ঙ) কোনও একটি মন্ত্রকের রাজনৈতিক প্রধান ও প্রশাসনিক প্রধান কারা?
(চ) রাজ্য সচিবালয়কে রাজ্য প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র বলা হয় কেন?
(ছ) পশ্চিমবঙ্গে যে সকল বিভাগের সচিবালয় আছে, তার কয়েকটি উল্লেখ করুন।
(জ) পরিষেবা সংক্রান্ত যে দায়িত্ব সচিবালয় পালন করে তার অন্তত দুটি উল্লেখ করুন।

3. 50টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন—
(ক) সচিবালয় বলতে কী বোঝায়?
(খ) রাজ্য সচিবালয়ের গঠন বৈশিষ্ট্য লিখুন।
(গ) রাজ্য সরকার ও রাজ্যসচিবালয়ের মধ্যে সম্পর্কের পশ্চাতে সমস্যাগুলি উল্লেখ করুন।
(ঘ) রাজ্য সবিচালয়কে কি ধরণের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়?
(ঙ) প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের কাজ কি?
(চ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত কি দায়িত্ব সচিবালয় পালন করে?

4. 150টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন—
(ক) রাজ্য সচিবালয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
(খ) রাজ্য সচিবালয়ের কাজ ও ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

(গ) বিভিন্ন রাজ্যে কল্যাণকামী সরকার সচিবালয়ের দক্ষতাকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে পারছে না কেন?

(ঘ) রাজ্য সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

(ঙ) রাজ্য সচিবালয় ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণসহ সমস্যার তীব্রতা ব্যাখ্যা করুন।

1.10 উত্তর সংকেত

1. (ক) সর্বভারতীয় কৃত্যক সদস্য
   (খ) সমগ্র সরকারের সচিব
   (গ) রাজ্য মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে যুক্ত
   (ঘ) রাজ্য সচিবালয়কে
   (ঙ) প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী অধিকর্তা

2. (ক) তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিন্যাস, গুরুত্ব অনুযায়ী অগ্রাধিকার (Priority) নির্ধারণ এবং যথাস্থানে নির্দেশ প্রেরণ সচিবালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সকল দায়িত্ব পালনপূর্বক সরকারকে নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে সচিবালয়। এই কারণে সচিবালয়কে 'ব্রেন ট্রাস্ট' বলা হয়।

   (খ) DLB পশ্চিমবঙ্গে 1978 সালে কাজ শুরু করে। বিধাননগর, বর্ধমান, ও জলপাইগুড়িতে DLB এর বিভাগীয় দপ্তর আছে।

   (গ) ভূমি সংস্কার, সাক্ষরতা, কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উন্নয়ন, শ্রমক্ষেত্রে কর্মচারী বীমা ও স্বনিযুক্তি প্রকল্প, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীকল্যাণ, পরিবেশ দূষণ রোধ প্রভৃতি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে একযোগে রাজ্য সচিবালয় সাফল্যের দাবি করতে পারে।

   (ঘ) সংযুক্ত কার্যালয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগ, যা ক্ষেত্রগত কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একে সঞ্চালক দপ্তরও বলা হয়ে থাকে।

   (ঙ) কোনও একটি মন্ত্রকের রাজনৈতিক প্রধান হলেন বিভাগীয় মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক প্রধান হলেন সরকারের সচিব মহোদয়।

   (চ) এস. আর. মহেশ্বরী সচিবালয়কে সরকারের 'স্নায়ুকেন্দ্র' বলেছেন, কারণ তাঁর মতে সচিবালয়ের মাধ্যমেই প্রশাসনের নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে।

   (ছ) পশ্চিমবঙ্গে সেচ, ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, পরিবহন, কারা, বিচার ও আইন প্রভৃতি বিভাগের সচিবালয় আছে।

   (জ) চাকরির নিয়মাবলি ও শর্তাদির অনুমোদন ও সংশোধন এবং সরকারি অধিকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি ও শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে শাস্তির সুপারিশ করে সচিবালয়

3. (ক) 1.4
   (খ) 1.5
   (গ) 1.6. এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'উদ্ভূত সমস্যাদি', 'প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ' ও 'অন্যান্য সমস্যা দ্রষ্টব্য'।

(খ) 1.6 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'অর্থনৈতিক দায়িত্ব' দ্রষ্টব্য।

(ঙ) 1.7 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের দায়িত্ব' দ্রষ্টব্য।

(চ) 1.6 এর অন্তর্ভুক্ত 'সাধারণ প্রশাসন সম্বন্ধিত দায়িত্ব' দ্রষ্টব্য।

4. (ক) 1.4

(খ) 1.6 সম্পূর্ণ (প্রত্যেকটি অংশে নির্বাচিত বক্তব্য উল্লেখ করুন)

(গ) 1.6. এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'উদ্ভূত সমস্যাদি', 'প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ' ও 'অন্যান্য সমস্যা দ্রষ্টব্য'।

(ঘ) 1.7

(ঙ) 1.7.3. (প্রেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ)

1.11 গ্রন্থপঞ্জি

1. Arora K. Ramesh and Goyal Rajni, Indian Public Administration, New Delhi, Wishwa Prakashan, 1995.
2. Maheswari, S.R., Indian Administration, New Delhi, Orient Longman, 1968, Revised Ed. 1995.
3. Maheswari, S.R., State Administration in India, New Delhi, Macmillan, 1979.
4. Bhattacharya, Mohit, Indian Administration, Kolkata, World Press, 2000.

একক 2 ☐ মুখ্য সচিব রাজ্য প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ

গঠন

2.0 উদ্দেশ্য
2.1 প্রস্তাবনা
2.2 মুখ্যসচিব পদসৃষ্টির পটভূমি ও গুরুত্ব
2.3 নিয়োগ ও কার্যকাল
2.4 মুখ্যসচিবের দায়িত্ব ও ভূমিকা
2.5 সারাংশ
2.6 অনুশীলনী
2.7 উত্তর সংকেত
2.8 গ্রন্থপঞ্জি

2.0 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে—

- মুখ্যসচিবের পদসৃষ্টি ও তাঁর পদমর্যাদার পরিবর্তনের ঘটনা পরিক্রমা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব হবে।
- মুখ্যসচিবের নিয়োগ, কার্যকাল ও ভূমিকা জানা যাবে।
- মুখ্যসচিবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যাবে।
- মুখ্য সচিবের পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

2.1 প্রস্তাবনা

রাজ্য সচিবালয়ের কর্ণধার হলেন (kingpin) রাজ্যের মুখ্যসচিব। তিনি রাজ্য প্রশাসনের অপরিহার্য অঙ্গ এবং প্রধান পরিচালক। প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিন্যাসে মুখ্যসচিবের স্থান সর্বোচ্চে। তিনিই সচিবালয়ে এবং প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী বিভাগে সমন্বয় সাধনের মূল দায়িত্বটি পালন করেন। সামগ্রিকভাবে মন্ত্রীসভার কার্য পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। নীতিগ্রহণ, রূপায়ন, প্রয়োগ ও ফিড্‌ব্যাক (Feed back) পর্যন্ত সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন মুখ্য সচিব এবং তিনি প্রশাসনিক নিরবচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। অন্ধ্রপ্রদেশ প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি তার প্রতিবেদনে (1964-65) যথার্থই বলেছে যে, 'He is the chief of the civil services and all governmental servants look to him to deal with all and every problem concerning their conditions of service and work'. (Maheswari, Indian Administration p. 526); অর্থাৎ মুখ্যসচিব সমগ্র রাষ্ট্রকৃত্যক কাঠামোর প্রধান এবং সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা তাদের চাকরি ও কাজের শর্তাদি ও সমস্যার জন্য তাঁর ওপর নির্ভর করে। তিনি রাজ্য প্রশাসনে নেতৃত্ব দেন, সরকারের প্রধান মুখপাত্র, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারের সঙ্গে অন্য রাজ্য সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা।

তাঁর দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র রাজ্য সরকারকেই সুষ্ঠু প্রশাসন উপহার দেয় তাই নয়, মুখ্যসচিবকেও কেন্দ্রীয় সচিবালয় বা ক্যাবিনেট সচিবালয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়।

2.2 মুখ্য সচিব পদসৃষ্টির পটভূমি ও গুরুত্ব

1799 সালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী প্রথম মুখ্যসচিবের পদ সৃষ্টি করেন। জি. এইচ. বারলো প্রথম এই পদে অভিষিক্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাজে সহায়তার জন্যেই এই পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যদিও প' বর্তীকালে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে মুখ্যসচিব পদের বিলুপ্তি ঘটে। বঙ্গীয় প্রশাসনিক অনুসন্ধান কমিটি তথা রাওল্যা ৮ কমিটি 1945 সালে মুখ্যসচিবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সুপারিশ করেন যে—

(i) মুখ্যসচিব হবেন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের প্রধান রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিক;

(ii) তিনিই ক্যাবিনেট সচিব ও ক্যাবিনেট উন্নয়ন কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করবেন;

(iii) রাজ্য উন্নয়ন পর্যদের সভাপতি হবেন মুখ্যসচিব; এবং

(iv) সকলপ্রকার উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে জেলা কালেক্টরের উর্ধ্বতন প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন মুখ্যসচিব।

1963 সালে রাজস্থান প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি রাজ্য প্রশাসন যন্ত্রের প্রধান চালক ও মন্ত্রী পরিষদের প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে মুখ্যসচিবের পদের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। বিভিন্ন সচিবালয়ের দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, সরকারের কাজে ধারাবাহিকতা, একরূপত্ব (uniformity) ও সঙ্গতি রক্ষা করার ক্ষেত্রে মুখ্যসচিবের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয় এই প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে,

(i) যে কোনও নতুন প্রকল্প, প্রস্তাব ও নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করার সময়ে এবং বিশেষ করে প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের পূর্বে মুখ্যসচিবের পরামর্শ অত্যন্ত আবশ্যক;

(ii) যে কোনও বিভাগীয় অধিকর্তাদের নিয়োগ, নিয়োগের তথা চাকরির স্থায়ীত্ব অনুমোদন, অবস্থান, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে মুখ্যসচিবের পরামর্শ অপরিহার্য হওয়া উচিৎ।

পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য প্রশাসনে মুখ্যসচিবের পদের গুরুত্ব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। বিভিন্ন বিভাগীয় কাজকর্মের সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসাবে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। মুখ্যসচিব সামগ্রিকভাবে সরকারের কাছে দায়বদ্ধ হলেও প্রধানত মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রাণাধীনেই তিনি কাজ করেন; তিনি প্রশাসন যন্ত্রের কর্ণধার ও প্রধান পরিচালক; মুখ্যসচিব সরকারের জনসংযোগকারী অধিকর্তা; তিনিই একাধারে মুখ্যসচিব, ক্যাবিনেট সচিব, সচিবালয় প্রশাসনের প্রধান ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা। মুখ্যসচিবের পদের এহেন গুরুত্বের জন্য 1973 সাল থেকে সবথেকে প্রধান সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিককেই এই পদে অভিষিক্ত করা হয়। তাঁর পদমর্যাদা ভারতসরকারের সচিবের সমতুল্য। 1973 সাল থেকে সকল রাজ্যের মুখ্যসচিবগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবের সঙ্গে সমহারে বেতন পান।

2.3 নিয়োগ ও কার্যকাল

নিয়োগ

রাজ্য প্রশাসনে মুখ্যমন্ত্রীর নিকটতম ব্যক্তি হলেন মুখ্যসচিব, যাঁর ওপর মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীই মুখ্যসচিবকে নির্বাচন করেন। এক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারেন, তবে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মুখ্যসচিবকে নিয়োগের সময়ে যে সকল বিষয়ের কথা মথায় রাখতে হয় তা হল—

(i) প্রবীণতা—প্রবীনতম রাষ্ট্রকৃত্যক অধিকর্তাদের মধ্য থেকেই মুখ্যসচিব নিযুক্ত হন। রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যে সর্বভারতীয় কৃত্যকের চার/পাঁচজন আধিকারিক থাকেন, তাঁদের মধ্য থেকেই মুখ্যসচিবকে নিয়োগ করতে হয়। সাধারণভাবে 20-25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আধিকারিকরাই বিবেচিত হন।

(ii) চাকরির সুনাম, কার্যকারিতা ও মেধা—মুখ্যসচিবের পদের গুরুত্ব এত অধিক যে চাকরি জীবনে দক্ষতা, কার্যকারিতা ও সততার জন্য সুনাম রয়েছে এমন বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই এই পদের জন্য বিবেচনা করা হয়।

(iii) মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা—মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিবের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মসৃণ না হলে এবং পরস্পরের প্রতি আস্থা না থাকলে প্রশাসন পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব পদে এমন কারোকে নিয়োগ করেন না, যাঁর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো নয় বা যাঁর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর যথেষ্ট আস্থা নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুখ্যসচিবের নিয়োগে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর থেকে অধিক গুরুত্ব পেলে রাজ্য প্রশাসনের গুণগত মান হ্রাস পেতে পারে। পক্ষান্তরে, মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহভাজন হিসাবে মুখ্যসচিব যদি তাঁর কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেন, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন বা উদ্ধত আচরণের দ্বারা সর্বস্তরে বিরোধ ও দূরত্ব সৃষ্টি করেন. সেক্ষেত্রেও প্রশাসনিক সংহতি ও কার্যকারিতা বিনষ্ট হতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে মুখ্যসচিবের ব্যক্তিগত দক্ষতা, গুণাগুন ও গতিশীলতার ওপর রাজ্য প্রশাসনের প্রকৃতি নির্ভর করে; সুতরাং মুখ্যসচিব নিয়োগে মুখ্যমন্ত্রীকে অধিক বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

কাযকাল

কর্মীব্যবস্থাপনায় একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল কার্যকাল। মুখ্যসচিবের পদটির জন্য কোনও স্থায়ী কার্যকাল নির্দিষ্ট করা হয় নি। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (নিউ দিল্লি, 1968) তার 1969 সালে পেশ করা প্রতিবেদনে মুখ্যসচিবের পদের জন্য অন্তত তিন থেকে চার বছর কার্যকাল নির্দিষ্ট করার সুপারিশ করে। এই সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হয় নি; কারণ হিসাবে প্রধানত বলা যায় যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পূর্বসুরীর পছন্দের মুখ্যসচিবকে পদে বহাল রাখতে গররাজি হতে পারেন।

মুখ্যসচিবের কার্যকাল নির্ভর করে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও কুশলতা, অভিজ্ঞতা এবং মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ওপর। বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয়ে তার মৌলিক চিন্তা ও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত তাঁর কার্যকালকে দীর্ঘতর করে। মুখ্যসচিবের সম্মানবোধ, নিরপেক্ষতা, নীরবে কাজ করার মানসিকতা তাঁকে যে কোনও রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে। মুখ্যমন্ত্রীরা সর্বদাই এমন মুখ্যসচিব পছন্দ করেন, যিনি সুচিন্তিত ও যথাযথ পরামর্শ দিয়ে তাঁদের প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করবেন; এরূপ মুখ্যসচিবের কার্যকাল রাজনৈতিক কারণে বিঘ্নিত হয় না।

2.4 মুখ্যসচিবের দায়িত্ব ও ভূমিকা

মুখ্যসচিব রাজ্য সচিবালয় প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ। রাজ্য প্রশাসনে তাঁর দায়িত্বের এলাকা কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের প্রধান কর্মসচিবের ন্যায় ব্যাপক এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর থেকেও বেশি। যেকোনও নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রথা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য সচিবের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মুখ্যসচিব রাজ্য ক্যাবিনেট সচিব হিসাবেও কাজ করে থাকেন; সমস্ত সচিবালয় তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং জনপালন কৃত্যকের প্রধান হিসাবে কাজ করেন। মুখ্যসচিব আঞ্চলিক পরিষদের (zonal council) সচিব হিসাবে পর্যায়ক্রমে কাজ করেন। রাজ্য কর্মীব্যবস্থাপনায় প্রধান নেতা হিসাবে মুখ্যসচিবের ভূমিকা অনবদ্য। সেক্রেটারিয়াট বিল্ডিং, লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় রেকর্ডরুম থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর কর্মীর ওপর তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য স্বীকৃত। তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিসচিব (super secretary) হিসাবেও কাজ করেন।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী অধিকর্তার কাজগুলি লিপিবদ্ধ করলে তাঁর ক্ষমতার ব্যাপকতা অনুভব করা যাবে।

মুখ্যসচিব মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা

মুখ্যসচিব ক্যাবিনেট সচিবালয়ের প্রধান। নীতি নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে মন্ত্রীপরিষদ এবং ক্যাবিনেট নীতি প্রণয়নে সহায়তা করেন। নীতি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞ পরামর্শ বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়। বিভাগীয় নীতি ও প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। নীতি প্রয়োগে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় রাজ্য প্রশাসনের ওপর যে বিশাল কর্মভার অর্পিত হয়েছে, তা সফলভাবে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে মুখ্যসচিবের গুরুত্ব অসীম। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীপরিষদের অনুরোধে ক্যাবিনেটের অধিবেশনে মুখ্যসচিব যে মতামত প্রকাশ করেন, নীতি নির্ধারণে তার প্রভাব পড়ে।

ক্যাবিনেট সচিবালয়ের প্রধান

প্রধানসচিব হিসাবে তিনি যে কোনও বিভাগ থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করতে পারেন, বিভাগীয় সিদ্ধান্তের ওপর নিজস্ব মতামত মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনতে পারেন; ক্যাবিনেট অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়সূচি প্রস্তুত, তথ্য সরবরাহ, আলোচিত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করা ও সংরক্ষণ, বিভিন্ন বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয়সাধন, প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদ যথাস্থানে প্রেরণ, সচিবালয় কমিটির অধিবেশনে পরিচালনের দায়িত্ব পালন প্রভৃতি

মুখ্যসচিবের কাজের এলাকার মধ্যে পড়ে। যে সকল বিষয় কেন্দ্র-রাজ্য অথবা আন্তঃরাজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তার ওপর মুখ্যসচিব বিশেষ নজর রাখেন। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সহায়ক হিসাবে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আন্তঃরাজ্য সম্মেলন বা আঞ্চলিক অধিবেশনের আয়োজক ও অংশগ্রহণকারী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজ্য মন্ত্রীসভা বা মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সংসদ অথবা রাজ্য বিধানসভায় যে সকল প্রশ্নাদি উত্থাপিত হয়, তার সমাধানে মুখ্যসচিবের সাহায্য অপরিহার্য।

রাজ্য প্রশাসনের প্রধান

প্রশাসনিক কর্তৃত্বের প্রধান অধিকারী হিসাবে মুখ্যসচিব দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট সচিব কেবলমাত্র ক্যাবিনেট সচিবালয়েরই প্রশাসনিক প্রধান। কিন্তু রাজ্যে মুখ্যসচিব ক্যাবিনেট সচিবালয় ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। এই বিভাগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাধারণ প্রশাসন, কর্মীব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক সংস্কার, পরিকল্পনা এবং অন্যান্য সচিবের নিয়ন্ত্রণে নেই এমন কিছু বিভাগ। কোনও বিভাগ মুখ্যসচিবের নিয়ন্ত্রণে থাকার অর্থ হল, বিভাগের মর্যাদা বৃদ্ধি, অতঃপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিকেই মুখ্যসচিবের তত্ত্বাবধীনে আনা হয়।

পূর্বে পরিকল্পনা বিভাগ মুখ্যসচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করত। রাজস্থানে প্রায় চার দশক এই বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মুখ্যসচিব। 1992 সালে প্রথম পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হয় একজন পৃথক সচিবের ওপর। তা সত্ত্বেও পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে মুখ্যসচিব তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। জাতীয় স্তরে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় মুখ্যসচিবের উপস্থিতি অপরিহার্য। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিগুলির চেয়ারম্যান হিসাবে মুখ্যসচিব বিভাগীয় প্রকল্প ও প্রস্তাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অনেক রাজ্যে এখনও মুখ্যসচিব পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে পালন করেন। বিভিন্ন রাজ্যে মুখ্যসচিব রাজ্য সরকারের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সঙ্গে সরাসরি জড়িত এবং প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিরাজস্ব, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, ত্রাণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, পার্বত্য ও বনাঞ্চল উন্নয়ন, তপশিলি ও আদিবাসী কল্যাণ, উচ্চ শিক্ষা, পূর্ত ও আবাসন, সমবায়, খাদ্য ও সরবরাহ, মৎস, পরিবহন, বিদ্যুৎ, তথ্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা

এক্ষেত্রে মুখ্যসচিবের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। বহু রাজ্যে সাধারণ প্রশাসন নামক একটি পৃথক বিভাগের সচিব হিসাবে মুখ্যসচিবের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের সমস্যা ও কাজের সঙ্গে যেমন মুখ্যসচিবের সম্পর্ক থাকে এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব রাজ্য প্রশাসনের ওপর যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনই তাঁকে কতকগুলি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

প্রশাসনিক সমন্বয়কারী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। যে সকল স্তরে এই সমন্বয়ের কাজ মুখ্যসচিবের তত্ত্বাবধানে হয় তা হল—

(i) কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়;

(ii) আন্তঃরাজ্য সমন্বয়;

(iii) রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভাগীয় পর্যায়ে সমন্বয়;

(iv) রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতা তথা মন্ত্রীদের মধ্যে সমন্বয়;

(v) রাষ্ট্রকৃত্যকের মধ্যে উল্লম্ব ও অনুভূমিক সহযোগিতা বৃদ্ধির তাগিদে সমন্বয়।

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যোগাযোগ স্থাপন করা, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, অর্থ, কর্মীব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটসচিব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, পরিকল্পনা-সচিব প্রমুখের যোগাযোগ বজায় রাখা মুখ্যসচিবের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের দায় অনেকাংশেই তাঁকে বহন করতে হয়। অন্যান্য শর্তের সঙ্গে উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যসচিবের সম্পর্কের ওপরেও নির্ভর করে কেন্দ্র-রাজ্য সৌহার্দের বিষয়টি। এই সমন্বয়ের কাজটি সহজতর করার জন্য কেন্দ্র মুখ্যসচিবদের সম্মেলনের ওপর জোর দেয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের ক্যাবিনেটসচিব। প্রতিবছর নিউদিল্লিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং কোনও একটি রাজ্যের মুখ্যসচিবের দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে সেই রাজ্য কতটা সুযোগ সুবিধা পেতে পারে।

বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা মুখ্যসচিবের অন্যতম দায়িত্ব। 1956 সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন (1956) অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সদস্য থাকেন— ঐ অঞ্চলের সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ ও মুখ্যসচিবগণ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার এবং এই পরিষদের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চেয়ারম্যানের ভূমিকা পালন করেন। এই আঞ্চলিক পরিষদের সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয় আবর্তন পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যসচিবদের। কেন্দ্র-রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বিরোধ মীমাংসা এবং সহজ আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিষদ গঠিত হয়।

উপরিউক্ত বাকি তিনটি স্তরে সমন্বয়ের জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে মুখ্যসচিবকে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীগণ, সচিবগণ, বিভাগীয় প্রধান, সরকারি ক্ষেত্রের আধিকারিকগণ, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, ডিভিশানাল কমিশনারগণ, জেলাশাসকগণ, গণমাধ্যম, জনসাধারণ, সাংসদ ও বিধানসভার সদস্যগণ, NGO প্রভৃতির সঙ্গে সচরাচর যোগাযোগ রাখতে হয়।

কর্মীব্যবস্থাপনা

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন এই ক্ষেত্রে মুখ্যসচিবের প্রধান ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

(i) তিনি রাজ্য জনপালন কৃত্যকের প্রধান। তাঁর অধীনস্থ সচিব, উচ্চপদস্থ সর্বভারতীয় কৃত্যক আধিকারিক (IAS officers), রাজ্য কৃত্যকের আধিকারিকরা (state civil service) এবং অন্যান্য কর্মচারীরা তাঁকে তাঁদের প্রধান উপদেষ্টা, বিবেক ও চেতনার রক্ষক ও নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতার ধারক হিসাবে বিবেচনা করেন।

(ii) তিনি রাজ্য সরকারের নির্দেশ অধিকর্তা কর্মচারীদের কাছে প্রেরণ করেন ও তার পালনের সুপারিশ করেন। নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব মুখ্যসচিবের। সামগ্রিকভাবে সচিবালয় প্রশাসনের তদারকির দায়িত্বে থাকেন মুখ্যসচিব। নির্দেশ অমান্য করা হলে বা শৃঙ্খলাভঙ্গ করার ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হলে মুখ্যসচিব সংশ্লিষ্ট সচিব, অধিকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারেন; তাঁর সুপারিশ মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন।

(iii) সরকারি অধিকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ফিলিপ উড্রাফ তাঁর The Men Who Ruled India : The Guardians বইতে উল্লেখ করেছেন যে, 'He was traditionally the source of postings and transfers; to most district officers he was in fact the Government' (Maheswari, Indian Administration, p. 527). জেলা অধিকর্তাগণ সরকার হিসাবে তাঁকেই স্বীকৃতি দেন। রাজ্য কৃত্যক থেকে সর্বভারতীয় কৃত্যকে পদোন্নতির বিষয়াদি এবং চাকরির প্রবীণতা বিবেচনার প্রসঙ্গ াদি মুখ্যসচিবের কাছেই প্রেরিত হয়। চাকরির শর্তাবলী (Rules of Business and Rules of Conduct) ও আচরণবিধি নির্ধারণ ও তার প্রয়োগে মুখ্যসচিবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই বিষয়ে কোনও সংশোধন বা পরিবর্তন আবশ্যক হলে মুখ্যসচিবের পরামর্শ জরুরী। রাজ্যে নিযুক্ত সর্বভারতীয় কৃত্যকদের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন (Annual Confidential Report) বা কাজের মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Performance Appraisal Reports) লেখেন মুখ্যসচিব; অতঃপর রাজ্য প্রশাসনে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকৃত। মন্ত্রীদের নিজস্ব বিভাগীয় কর্মীদের ওপরেও মুখ্যসচিবের নিয়ন্ত্রণ স্পষ্ট। যে সকল রাজ্যে লোকসেবা আয়োগের দপ্তর আছে, সেখানে আয়োগের বাৎসরিক প্রতিবেদন মুখ্যসচিবের মাধ্যমেই সঞ্চালিত হয়ে আইনসভায় পৌঁছায়। আয়োগ-প্রধানের নিয়োগেও মুখ্যসচিবের ভূমিকা থেকে যায়। রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণত মুখ্যসচিবের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এরূপ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে কর্মী পরিচালনায় মুখ্যসচিবের নিয়ন্ত্রণ স্পষ্ট। কোনও রাজ্যে পৃথক কর্মী পরিচালনা বিভাগের সচিব থাকলেও তিনি মুখ্যসচিবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন।

জরুরী অবস্থা

জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে মুখ্যসচিব রাজ্য প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে কাজ করেন। উল্লেখ্য যে, 356 ধারা অনুযায়ী রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা প্রযুক্ত হলে মুখ্যসচিবের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য শাসন করেন। তখন মুখ্যসচিবই রাজ্য প্রশাসনের হাল ধরেন।

মন্ত্রীরা না থাকায়, বিভাগীয় সচিবরা মুখ্য সচিবের নির্দেশে পরিচালিত হন, এবং রাজ্যপাল, মুখ্যসচিবের মাধ্যমেই সমস্ত বিভাগের কাজকর্মের নির্দেশ দেন। এইখানে রাজ্যপাল ও মুখ্যসচিব যৌথভাবে সরকার পরিচালনা করেন। রাজ্যপাল যদি দক্ষ প্রশাসক না হন, তাহলে মুখ্য-সচিব, তাঁর দক্ষ প্রশাসনিক পরা মর্শদাতা হিসাবে অনেকটাই রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা করেন।

তাঁর কাজের ও দায়িত্বের কোনো অন্ত নেই এবং সব কিছু লিপিবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। সরকারের সমস্ত কর্মসূচি ও ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়সাধনে সব সময়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হয়। তাই সচিবালয়ের সমস্ত গুরুত্ব পূর্ণস্তরে, বহু আলোচনা সভায়, অধিবেশন ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং তাতে উপস্থিত থেকে সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টা করতে হয়।

এই সব প্রক্রিয়া ছাড়া, কাঙ্খিত ও বাঞ্ছিত গতিতে সমগ্র সরকারের জনস্বার্থ সম্পর্কিত কর্মসূচি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এই সব ব্যাপারে সফল হতে হলে চাই মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন।

রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব ও ভূমিকা সংক্রান্ত উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে

বলা যেতে পারে, যে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মুখ্য সচিবের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুশাসনের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত (all parvading)।

বর্তমানে ভারতীয় গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য মুখ্য সচিবের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার আস্থাভাজন হওয়া খুবই জরুরী। সেই আস্থার জন্য দুই পক্ষেরই অত্যন্ত নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ, সংবেদনশীল ও কর্মদক্ষ হওয়া প্রয়োজন।

2.5 সারাংশ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মুখ্যসচিবের পদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশাসন পরিচালনায় তাঁর নেতৃত্ব অপরিহার্য। তিনি সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের প্রধান চালক ও মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যতম পরামর্শদাতা। প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অন্যতম দায়িত্ব মুখ্যসচিবের ওপরেই বর্তায়। তিনি কেন্দ্র-রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান মাধ্যম। উপরন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনবদ্য প্রকৃতির জন্য মুখ্যসচিবের ভূমিকাও বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্য হিসেবে তিনি কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী। কেন্দ্রীয় সচিবালয় বা ক্যাবিনেট সচিবালয়ে পদোন্নতির উচ্চাভিলাষ এবং রাজ্যের প্রশাসনের অন্যতম বাহক হিসাবে তাঁর ভূমিকা অনেকসময়েই তাঁকে নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধার সম্মুখীন করতে পারে। তাঁর এই সঙ্কট দুটি ক্ষেত্রে তীব্রতর হয়। এক, যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকে এবং জরুরী অবস্থা বা শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সময়ে যখন রাজ্য মন্ত্রীসভার কোনও ভূমিকা থাকে না। এমতাবস্থায় মুখ্যসচিবের দক্ষতা, সচেতনতা, নিরপেক্ষতা, দায়িত্ববোধ এবং রাজনৈতিক নির্লিপ্ততাই তাঁর ভূমিকাকে উজ্জ্বল করতে পারে।

2.6 অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন। (উত্তর সংকেত 28 পৃষ্ঠায়)।

(ক) মুখ্যসচিব—
- (i) কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অঙ্গ,
- (ii) রাজ্য প্রশাসনের অঙ্গ,
- (iii) উভয়ের সঙ্গেই যুক্ত,
- (iv) কোনটিই নয়।

(খ) রাজস্থান প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি তৈরি হয়—
- (i) 1799
- (ii) 1945
- (iii) 1950
- (iv) 1963.

(গ) The Men Who Ruled India : The Guardians এর লেখক হলেন—
- (i) এস. আর মহেশ্বরী,
- (ii) এস. এস. খেরা,

(iii) পল. এইচ এ্যাপেলবি,

(iv) ফিলিপ উড্রাফ্।

(ঘ) মুখ্যসচিবে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন—

(i) প্রধানমন্ত্রী,

(ii) রাষ্ট্রপতি,

(iii) ক্যাবিনেট সচিব

(iv) এঁদের কেউই নন।

(ঙ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান—

(i) প্রধানমন্ত্রী,

(ii) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী,

(iii) ক্যাবিনেট সচিব,

(iv) এঁদের কেউই নন।

2. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন—

(ক) ভারতবর্ষে মুখ্যসচিবের পদ কবে সৃষ্টি হয় ও কে সৃষ্টি করেন?

(খ) ভারতে প্রথম মুখ্যসচিবের পদ কে অলঙ্কৃত করেন?

(গ) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (1968) মুখ্যসচিবের কার্যকাল নিয়ে কী সুপারিশ করেন?

(ঘ) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের মুখ্যসচিবের কার্যকাল সংক্রান্ত সুপারিশ গ্রহণ না করার প্রধান কারণ কী?

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যসচিব উন্নয়নের যে সকল ক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তার অন্তত পাঁচটি উল্লেখ করুন।

(চ) আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য কী?

3. সংক্ষেপে উত্তর দিন (50টি শব্দের মধ্যে)।

(ক) মুখ্যসচিবের পদের গুরুত্ব সম্বন্ধে রাওল্যান্ড কমিটির মন্তব্যগুলি লিখুন।

(খ) মুখ্যসচিবের পদে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক?

(গ) রাজ্য ক্যাবিনেট সচিবালয়ের প্রধান হিসাবে মুখ্যসচিবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) সরকারি নীতি নির্ধারণে মুখ্যসচিবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে মুখ্যসচিবদের সম্মেলন কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

(চ) জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে মুখ্যসচিবের দায়িত্ব উল্লেখ করুন।

4. সামগ্রিক প্রশ্নাবলী (150টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন)।

(ক) রাজ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সঙ্গে মুখ্যসচিব কীভাবে যুক্ত তা বিস্তারিত লিখুন।

(খ) কর্মীব্যবস্থাপনায় মুখ্যসচিবের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

(গ) প্রশাসনিক সমন্বয়কারী হিসেবে মুখ্যসচিবের দায়িত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

(ঘ) কীভাবে এবং কেন মুখ্যসচিব পদটির সৃষ্টি হয়?

(ঙ) মুখ্যসচিবের নিয়োগ ও কার্যকাল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

2.7 উত্তর সংকেত

1. (ক) রাজ্য প্রশাসনের অঙ্গ।
   (খ) 1963 সালে।
   (গ) ফিলিপ উড্রাফ্।
   (ঘ) ক্যাবিনেট সচিব।
   (ঙ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

2. (ক) 1799 সালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী প্রথম মুখ্যসচিবের পদ সৃষ্টি করেন।
   (খ) জি. এইচ. বারলো ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মুখ্যসচিবের পদ অলঙ্কৃত করেন।
   (গ) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (নিউ দিল্লী, 1968) তার 1969 সালে পেশ করা প্রতিবেদনে মুখ্যসচিবের পদের জন্য অন্তত তিন থেকে চার বছর কার্যকাল নির্দিষ্ট করার সুপারিশ করেন।
   (ঘ) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন মুখ্যসচিবের কার্যকাল নিয়ে যে সুপারিশ করেন, তা কার্যকর করা সম্ভব হয় নি; তাঁর প্রধান কারণ হল— মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পূর্বসূরীর পছন্দের মুখ্যসচিবকে পদে বহাল রাখতে গররাজি হতে পারেন।
   (ঙ) পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যসচিব ভূমিরাজস্ব, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ ত্রাণ প্রভৃতি উন্নয়ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।
   (চ) কেন্দ্র-রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বিরোধ মীমাংসা এবং সহজ আদান প্রদানের উদ্দেশ্যে 1956 সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন (1956) অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়।

3. (ক) 2.2 দ্রষ্টব্য।
   (খ) 2.3 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ (iii) দ্রষ্টব্য।
   (গ) 2.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'ক্যাবিনেট সচিবালয়ের প্রধান দ্রষ্টব্য।'
   (ঘ) 2.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'মুখ্যসচিব মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা' দ্রষ্টব্য।
   (ঙ) 2.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা' দ্রষ্টব্য।
   (চ) 2.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'জরুরী অবস্থা' দ্রষ্টব্য।

4. (ক) 2.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'রাজ্য প্রশাসনের প্রধান' দ্রষ্টব্য (দ্বিতীয়াংশ)।
   (খ) 2.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'কর্মীব্যবস্থাপনা' দ্রষ্টব্য।
   (গ) 2.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা' দ্রষ্টব্য।

(ঘ) 2.2

(ঙ) 2.3

2.8 গ্রন্থপঞ্জি

1. Maheswari, S., Indian Administration, (5th Ed.), New Delhi, Orient Longman, 1995.
2. Arora, R. K., Goyal, R., Indian Public Administration (2nd Edition), New Delhi, Whishwa Prakashan, 1997.
3. Bhattacharya, Mohit, Indian Administration, Kolkata, World Press, 2000.
4. Maheswari, S.R., State Administration in India, New Delhi, Macmillan, 1979.

একক 3 ❑ জেলা প্রশাসন ও জেলাশাসক (কালেক্টর)

গঠন

3.0 উদ্দেশ্য
3.1 প্রস্তাবনা
3.2 প্রাক্ স্বাধীন ভারতে জেলা প্রশাসন ও জেলাশাসকের প্রকৃতি
3.3 স্বাধীন ভারতে জেলাশাসকের পরিবর্তিত অবস্থান
3.4 জেলাশাসকের নিয়োগ, কাজ, দায়িত্ব ও ভূমিকা
3.5 জেলাশাসক পদের গুরুত্ব
3.6 সারাংশ
3.7 অনুশীলনী
3.8 উত্তর সংকেত
3.9 গ্রন্থপঞ্জি

3.0 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে—

- জেলাপ্রশাসনের স্বরূপ জানা যাবে।
- জেলাশাসক পদের উৎপত্তি ও তার ভূমিকার বিবর্তন সম্বন্ধে জানা যাবে।
- জেলাশাসকের নিয়োগ কাজ, দায়িত্ব ও পদমর্যাদা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যাবে।
- গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণে জেলা শাসকের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জানা যাবে।

3.1 প্রস্তাবনা

বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিরিখে কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলাস্তরে এই বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়ে থাকে। ভারতের ন্যায় বৃহৎ গ্রাম-প্রধান রাষ্ট্রে জেলা প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা সর্বকালেই যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। মনুস্মৃতি থেকে শুরু করে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ভারতেও জেলাপ্রশাসনের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের শাসনকালের শুরুতে জেলা প্রশাসন সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ না দেখালেও পরে তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং 1772 সালে ওয়ারেন হেস্টিংস জেলা কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন। 1844 সালে এক একটি জেলাকে কয়েকটি মহকুমাতে ভাগ করে তা একজন মহকুমা শাসকের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। স্বাধীন ভারতে উন্নয়নের প্রশাসনকে বাস্তবায়িত করার জন্য জেলাকে মহকুমা, ব্লক ইত্যাদিতে ভাগ করে নিয়ে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে প্রশাসন পরিচালনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসন পরিচালনায় সর্বাধিক গুরুত্ব ও দায়িত্বের অধিকারী হলেন জেলা শাসক। ব্রিটিশ

শাসনকালেও জেলা শাসক বা জেলা কালেক্টর বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জাতিগঠন ও উন্নয়নে যে জোয়ার আনার চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে জেলাশাসক আর কেবলমাত্র আইনশৃঙ্খলার রক্ষক ও রাজস্ব সংগ্রাহক নন। তিনি গণতান্ত্রিক প্রশাসনের প্রধান চালক এবং সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে অন্যতম যোগসূত্র।

3.2 প্রাক্‌স্বাধীন ভারতে জেলা প্রশাসন ও জেলাশাসকের প্রকৃতি

1961 সালে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ওপর মহারাষ্ট্র কমিটি যে প্রতিবেদন পেশ করে, তাতে জেলাকে স্থানীয় প্রশাসনের অন্যতম কার্যকারী একক বলে বর্ণনা করা হয়। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, প্রযুক্তিগত ও মানবসম্পদের সংগ্রহ ও সমন্বয় করে সুসংহতভাবে জেলার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রধান মাধ্যম হিসাবে জেলা প্রশাসনকে দেখা হয়। পরিকল্পিত উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসনের ওপর নির্ভরতাকে অস্বীকার করা যায় না।

জেলা প্রশাসন মোঘল আমলে প্রথম প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে প্রাক্‌মোঘল যুগে গ্রামীণ ও পৌর প্রশাসনের যে উদাহরণ পাওয়া যায় তা অনবদ্য। এখন যাকে জেলা বলা হয়, প্রাচীন ভারতে তা বিষয় নামে পরিচিত ছিল। একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এক থেকে দুই হাজার গ্রাম। বিষয়ের শাসককে বিষয়পতি বলা হত। মৌর্যযুগে তিনি বিষয়াধ্যক্ষ নামে পরিচিত ছিলেন; অশোকের শিলালিপিতে বিষয়াধ্যক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষয়পতি জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও কর বা খাজনা আদায়ের তদারকি করতেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সম্ভবত বিষয়পতিকে 'দণ্ডনায়ক' (পুলিশ বা সেনা) এর সাহায্য নিতে হত এবং বিচারের কাজও (ম্যাজিস্ট্রেট) করতে হত। অশোকের আমলে 'রাজ্জুক' নামক আধিকারিককে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতে হত। গুপ্তযুগে জেলা প্রশাসনে গণ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল এবং বিষয়পতি কর্তৃক পরামর্শদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্যযুগ ও গুপ্তযুগে সম্ভবত সর্বপ্রথম সুসংগঠিত জেলা প্রশাসনের সূত্রপাত হয়; তবে মনুস্মৃতিতে 'সহস্রাধিপের' উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি বিষয়পতি বা জেলা শাসকের সমতুল্য বলে মনে করা যেতে পারে।

মোঘল আমলেও জেলাপ্রশাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোঘল আমলে সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা সুবায় ভাগ করা হয়েছিল। প্রদেশের শাসনের দায়িত্বে ছিলেন সুবাদার এবং রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন দেওয়ান। প্রদেশগুলিকে কয়েকটি সরকার বা জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। কারোরি ফৌজদার ছিলেন বর্তমান প্রশাসনের পরিভাষায় জেলা কালেক্টর।

ব্রিটিশ শাসনকালে ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার্থে স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা হয়। জেলা কালেক্টরের পদের উৎপত্তি হয় 1772 সালে। ওয়ারেন হেস্টিংস এর আমলে রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র হিসাবে তৎকালীন জেলা শাসক ব্যবহৃত হতেন। এই পদের অবলুপ্তি ঘটে 1773 সালে; কিন্তু পুনরায় 1781 সালে জেলা কালেক্টরের পদের পুনরুত্থান হয়। 1787 সালে কালেক্টর, দেওয়ান, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদগুলির মধ্যে সম্মেলন ঘটিয়ে জেলা কালেক্টরের ভূমিকার বিস্তার করা হয়। 1793 সালে 'Cornwallis Code' অনুযায়ী বিচার ও ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বভার অর্পিত হয় জেলা কালেক্টরের ওপর। ব্রিটিশ রাষ্ট্রকৃত্যকের অধিকর্তারাই এই দায়িত্ব পেতেন। 1833 ও 1843 সালে যথাক্রমে উপকালেক্টর এবং সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করে

(Non-covenanted বা চুক্তি বহির্ভূত পদ) ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। এই পরিবর্তন অবশ্য কেবলমাত্র বাংলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছিল।

সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত কালেক্টর রাজস্ব সংগ্রাহক, স্থানীয় তহবিল রক্ষক, আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক, পুলিশ অধিকর্তা এবং কারাবিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতেন। (G. Chesney, Indian Polity, pg. 169-71) 1857 থেকে 1909 পর্যন্ত সময়কালে জেলাশাসকের ক্ষমতার চূড়ান্ত ব্যাপ্তি ঘটে। গ্রামীণ প্রশাসনের সর্বস্তরে রাজস্ব আদায় থেকে গ্রামীণ বিবাদ মীমাংসা পর্যন্ত কালেক্টর তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। 1861 সালের পুলিশ এ্যাক্ট অনুযায়ী পুলিশ বিভাগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব জেলাশাসকের ওপর বর্তায়। তাঁর অতিরিক্ত কর্মভার সমস্যা সৃষ্টি করলে 'বিকেন্দ্রীকরণের ওপর রাজকীয় কমিশন' (Royal Commission upon Decentralisation) গঠিত হয়। কিন্তু কমিশনের সুপারিশে জেলাশাসকের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। এই অবস্থা 1919 সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।

1919 সালে সংস্কার আইন অনুযায়ী জেলাশাসকের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। নবনির্মিত আইনসভার ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং নির্বাচিত মন্ত্রীদের ওপর কিছু বিভাগীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসনে কালেক্টরের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি; এমনকি সাইমন কমিশনও (1930) জেলা শাসকের গুরুত্ব হ্রাস না করার সুপারিশ করে।

1935 সালের আইনানুযায়ী জেলাশাসককে মন্ত্রীদের সহযোগিতায় কাজ করতে হত। 1937 সালে কংগ্রেস ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনে জয় লাভ করে এবং গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয় কালেক্টরের হাতে। জেলা কালেক্টর রাজস্ব আদায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ ও জেল ব্যবস্থার তদারকি, ফৌজদারি বিচার পরিচালনা প্রভৃতি দায়িত্বও এই সময়ে পালন করতেন।

3.3 স্বাধীন ভারতে জেলাশাসকের পরিবর্তিত অবস্থান

স্বাধীন ভারতে জেলাশাসকের ভূমিকা বহুমুখী রূপ ধারণ করে। কল্যাণমুখী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিকেন্দ্রীকরণ প্রবণতা, উন্নয়নের প্রয়াস, জনচেতনা বৃদ্ধি প্রভৃতির সম্মিলিত চাপ জেলাশাসকের দায়িত্ব ও ক্ষমতার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জেলা কালেক্টরের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, অপুষ্টি রোধ, স্বাস্থ্যোন্নয়ন, মৌলিক কাঠামোর বিকাশ, যথা— বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, সেচ, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণের উত্তরোত্তর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সমন্বয়কারী প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে জেলাস্তরে জেলা শাসকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পঞ্চাশের দশকে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হলে জেলা কালেক্টরের ভূমিকার প্রকৃতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে বাস্তবায়িত করার যথাসাধ্য সফল প্রয়াস করা হয়, ফলে জেলাশাসকের আমলতান্ত্রিক কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়ে গণমুখী ভূমিকা জোরদার হবে বলে আশা করা হয়। কিন্তু গ্রামীণ জনসাধারণের অজ্ঞতা ও রাজনৈতিক জটিলতা আমলাতান্ত্রিক প্রভাব হ্রাসের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এসত্ত্বেও অধিকাংশ রাজ্যেই জেলাশাসক উন্নয়নের প্রশাসনের অন্যতম বাহক হয়ে উঠেছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় জেলাশাসক ছিলেন ব্রিটিশ শাসকের শোষণের হাতিয়ার, স্বাধীন ভারতে জেলাশাসক জনকল্যাণের বাহক। ভারতীয় সংবিধানের 50 নম্বর ধারায় শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথক

করার কথা বলা হয়েছে; সেইমত জেলাশাসক স্বাধীন ভারতের ন্যায় বর্তমানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ব্যাপক বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করেন না। রাজনৈতিক দলগুলিও জেলাশাসকের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। উন্নয়নের তাগিদে বহু বিভাগ গড়ে তোলা হয়েছে এবং তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞদের হাতে। অতঃপর সাধারণ (generalist) প্রশাসক হিসেবে জেলাশাসকের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সকল রাজ্যে জেলাশাসক একই ভূমিকা পালন করেন না।

3.4 জেলা শাসকের নিয়োগ, কাজ, দায়িত্ব ও ভূমিকা

নিয়োগ

রাজ্যকৃত্যক বা সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক থেকে জেলাশাসক নিযুক্ত হন। ভূমি রাজস্ব নিয়মানুযায়ী (Land Revenue Code) জেলাশাসকের নিয়োগ হয়। সর্বভারতীয় কৃত্যক বিধি অনুযায়ী জেলাশাসকের রাজ্যভিত্তিক অবস্থান সুনিশ্চিত হয়। সর্বভারতীয় কৃত্যক সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রথম নিয়োগই জেলাশাসক হিসেবে হতে পারে। রাজ্যকৃত্যকের ক্ষেত্রে পঞ্চাশোর্ধ বছরের প্রবীণকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী কালেক্টরের পদ থেকে জেলাশাসক পদে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাজ

ব্রিটিশ শাসনকালে জেলাশাসক ব্রিটিশ সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রতিভূ হিসাবে কাজ করতেন। আইনসম্মত শাসক, ন্যায়বিধাতা ও জীবন-সম্পত্তির রক্ষাকর্তা হিসাবে ঔপনিবেশিক জেলাশাসক কাজ করতেন। স্বাধীন ভারতে জেলাশাসক উন্নয়নের অন্যতম রূপকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় যে, জেলা স্তরে কালেক্টর বা ডেপুটি কমিশনার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভাগগুলির কাজের তদারকি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবেন এবং জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও প্রয়োগে সহায়তা করবেন। উন্নয়নের কাজের বাৎসরিক মূল্যায়নের দায়িত্বও জেলাশাসককে দেওয়ার সুপারিশ হয়।

জেলা কালেক্টরের বা শাসকের কাজগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। সংগ্রাহকের কাজ; আইন শৃঙ্খলার রক্ষক; জেলার মুখ্য প্রশাসনিক অধিকর্তা; সমন্বয়কারী; সঙ্কটকালীন প্রশাসক; উন্নয়ন অধিকর্তা; অন্যান্য, যথা— জনসংযোগ রক্ষাকারী, শিষ্টাচার (protocol) আধিকারিক, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সহায়ক ইত্যাদি।

কালেক্টর হিসাবে জেলাশাসক

জেলা শাসকের প্রধান দায়িত্ব রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও সময়মতো তা সংগ্রহ করে প্রশাসনকে সচল রাখা। এই কাজে মহকুমা শাসক, তহশীলদার, নায়েব তহশীলদার, কানুনগো প্রমুখ আধিকারিক ও কর্মচারীরা তাঁকে সাহায্য করেন। যে সকল খাতে তিনি সংগ্রহ করেন তা হল— সেচকর, কৃষি আয়কর, ক্যানাল কর, ভূমিরাজস্ব, বিক্রয় বা হাতবদলের জন্য প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প ডিউটি, নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে বিক্রয়কর ইত্যাদি।

এছাড়া সরকারি ঋণ, বিশেষত 'টাকাভি' ঋণ প্রদান ও প্রাপ্য অর্থ উদ্ধার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে ক্ষয়ক্ষতি হিসাব, কৃষিঋণ প্রদান, পুনর্বাসনের জন্য অর্থপ্রদান, সরকারি সম্পত্তি ও কোষাগার পরিচালনা ও সংরক্ষণ জেলা কালেক্টরের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বীজ ও কৃষির অন্যান্য উপাদান প্রদান, জমির খণ্ডীকরণ রোধ, সরকারি জমির উদ্ধার ইত্যাদিও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই সকল বিষয়ে রেকর্ড সংরক্ষণ ও তার পর্যালোচনার কাজও কালেক্টর করে থাকেন। জেলা রাজস্ব আধিকারিক তাঁর প্রধান সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে জেলাশাসক

জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব বর্তায় জেলা শাসকের ওপর। জেলা স্তরে পুলিশ, বিচার বিভাগ ও জেল প্রশাসন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ। জেলাস্তরে পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ দায়িত্বে থাকেন সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ, যিনি পদাধিকার বলে ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে পরিচালিত হয়। পুলিশ অ্যাক্টের সেকসন্ 4এ যে কোনও সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলায় পুলিশকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

এছাড়া জেলার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, কারাগার পরিদর্শন, বন্দিমুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জেলায় অনাদায়ী ঋণ আদায়, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা, সরকারের কাছে ফৌজদারি প্রতিবেদন পেশ, নির্বাচনী ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বহুবিধ প্রশাসনিক দায়িত্ব জেলা শাসক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে পালন করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকাকে জটিল করে তুলেছে।

বর্তমানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অন্তত দুটি ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। তাঁর পুলিশ প্রশাসন ও বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রশ্নের অবকাশ তৈরি করেছে। পুলিশ প্রশাসনে কর্তৃত্ব সংঘাত একটি বড় সমস্যা। কলকাতা, বম্বে (মুম্বাই), দিল্লি ও মাদ্রাজে (চেন্নাই), পুলিশ প্রশাসন মূলত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার বহির্ভূত এবং তা পুলিশ কমিশনারের অধীনস্থ। সংঘাত ব্যক্তিত্বের না ব্যবস্থার, তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রশ্ন উঠতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির 50 নম্বর ধারায় বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বিরোধী বলে সমালোচিত হয়। বর্তমানে হাইকোর্টকে এই ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রাখা হয়েছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ দায়ের করা যায়।

জেলার মুখ্য প্রশাসনিক অধিকর্তা

(i) জেলা প্রশাসনে প্রয়োজনীয় কর্মীদের নিয়োগ, বদলি, ছুটি প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
(ii) কর্মী ও অধিকর্তাদের আচরণবিধি নির্ধারণ ও শৃঙ্খলারক্ষা এবং শৃঙ্খলাভঙ্গ অথবা কর্মে গাফিলতির অভিযোগে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
(iii) কর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা;
(iv) জেলার বাৎসরিক বাজেট পেশ ও আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা;

(v) সরকারি অর্থ ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ;

(vi) জেলা থেকে প্রেরিত বিধানসভার সদস্য, সাংসদ ও মন্ত্রীদের জেলায় ভ্রমণসূচি নির্ধারণ, থাকার ও অন্যান্য ব্যবস্থা করা;

(vii) বাৎসরিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন পেশ;

(viii) বিভিন্ন সভা, সমিতি ও উন্নয়ন কমিটিতে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ;

(ix) রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন;

(x) প্রশাসনিক স্তরে জেলার বাসিন্দাদের সমস্যা ও অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের চেষ্টা করা ইত্যাদি।

সমন্বয়কারী হিসাবে জেলাশাসক

পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা সঠিক রূপ নেওয়ার আগে পর্যন্ত জেলা শাসক বিভিন্ন জেলাভিত্তিক সরকারি সংস্থাগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেন। বলবন্ত রাই মেহেতা কমিটি তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, জেলাশাসকের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভাগগুলির অধিকর্তাদের নেতা হিসাবে কাজ করা উচিত এবং উন্নয়নের জন্য রচিত জেলা পরিকল্পনা প্রস্তুত ও প্রয়োগে প্রয়োজনীয় সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

জেলাস্তরে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ও সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ আছে। জনস্বাস্থ্য, কৃষি, সেচ, শিক্ষা, পূর্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে জেলাস্তরে উন্নয়নের কাজ পরিচালিত হয়। এই সকল বিভাগের নিজস্ব আমলাতান্ত্রিক ও বিশেষজ্ঞ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছেন, যাঁদের কাছে জেলা অধিকর্তারা দায়বদ্ধ। এই ক্ষেত্রে সমন্বয়কারী হিসাবে জেলা শাসকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়; জেলা পরিকল্পনার সাফল্য ও সাফল্যের দায় কার ওপর বর্তায়, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

সংকটকালীন প্রশাসক

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, খরা থেকে শুরু করে দাঙ্গা, বহিরাক্রমণ প্রভৃতি মানুষ সৃষ্ট সংকটে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। মহামারী প্রতিরোধেও জেলাশাসককে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হয়। সরকারি ত্রাণের উপযুক্ত ব্যবহার, খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের হিসাব ও তালিকা প্রস্তুত প্রভৃতি জেলাশাসকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বর্তমানে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ জেলাশাসকের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করছে বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। সংকটের মোকাবিলায় জেলাশাসককে লিখিত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়; লক্ষ রাখতে হবে যে, এই অতিরিক্ত ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়; আমলাতান্ত্রিক অনমনীয়তা ও নীতি-নিয়ম নির্ভরতা জেলাশাসকের সচলতা যাতে নষ্ট না করে, তা দেখতে হবে।

উন্নয়ন অধিকর্তা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে জেলাশাসকের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। 1952 সালে গৃহীত 'Community Development Programme' থেকে গ্রামীণ উন্নয়নে একটি পরিকল্পিত গতি আনার চেষ্টা করা হয়। এরপরে আসে IRDR সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme); গ্রামীণ যুবকদের জন্য গৃহীত হয় TRYSEM। স্বনিযুক্তির জন্য গ্রামীণ যুবকদের প্রশিক্ষণ (Training the Rural Youth for Self Employment) এবং

মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয় DWCRA (Development of Women and Children in Rural Areas)। এছাড়াও জওহর রোজগার যোজনা, ইন্দিরা রোজগার যোজনা, সমগ্র গ্রাম বিকাশ প্রকল্প প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে জোয়ার আনার চেষ্টা হয়। অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নের জন্য Desert Development Programme, Drought Prone Area Programme বা উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। এই সমস্ত প্রকল্পগুলিকে কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জেলাশাসকের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। এই প্রকল্পগুলি প্রয়োগে প্রধান দায়িত্ব তাঁরই। জেলা শিল্প কেন্দ্র, জেলা ব্যাঙ্ক সমন্বয় কমিটির চেয়ারপার্সন হিসাবে জেলাশাসক কাজ করেন।

এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে জেলা পরিষদের সঙ্গে একযোগে জেলাশাসককে কাজ করতে হয়। বলবন্তরাই মেহেতা কমিটি যে ধরনের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত সুপারিশ করে, তদনুসারে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে জেলাশাসকের একটি বিশেষ ভূমিকা থেকে যায়। অনুমান করা হয়েছিল যে জেলাশাসক তাঁর বিচক্ষণতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সাহায্যে জেলাপরিষদের উন্নয়নমুখী কাজে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আদৌ সুখকর হবে কিনা তা তখন ভাবা হয় নি। জনগণের কাছে আমলাদের দায়বদ্ধতা থাকে না। রাজনৈতিক নেতা বা সরকার যদি সচেতন না হন বা জনগণ যদি অজ্ঞ হয়, সেক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজে গণ অংশগ্রহণ সম্ভব নয় এবং জনগণের সঙ্গে দূরত্ব রেখে উন্নয়নকে কতটা বাস্তবমুখী করা যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যেতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যে জেলা পরিষদের সঙ্গে জেলাশাসকের সম্পর্কের বিন্যাসে বিভিন্নতা এসেছে। যেমন—

(a) উড়িষ্যা, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি—জেলাশাসক জেলা পরিষদের সদস্য।

(b) রাজস্থান— জেলাশাসক জেলা পরিষদের সদস্য হলেও তার ভোটদানের অধিকার নেই।

(c) মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি— জেলাশাসক জেলাপরিষদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নন।

বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে জেলাশাসককে উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়— যেমন,

(a) মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক— উন্নয়নের দায়িত্বে আছেন পৃথক জেলা উন্নয়ন আধিকারিক।

(b) উত্তরপ্রদেশ— উন্নয়নের দায়িত্ব ভাগ করে নেন— জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (প্রশাসনিক)।

(c) মহারাষ্ট্র— সহকারী কালেক্টর সকল কাজে জেলাশাসককে সাহায্য করেন;

1977 এর অশোক মেহেতা কমিটির প্রতিবেদন প্রথম জেলাশাসকের ভূমিকাকে খর্ব করে। 1980 সালে কংগ্রেস সরকার পুনরায় জেলা শাসকের ক্ষমতাকে ফিরিয়ে দেয়। 1993 ও 1994 সালে সংবিধান সংশোধন করে উন্নয়নের কাজে জেলাশাসকের ভূমিকাকে খর্ব করে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য ক্ষমতা

(a) প্রতি দশ বছরে জনগণনা পরিচালনা;

(b) নির্বাচনী আধিকারিক;

(c) বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার তদারকি;

(d) শিষ্টাচার (protocol) অধিকর্তা হিসাবে কাজ করা;
(e) জেলাস্তরে সামরিক ও অসামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা;
(f) কর্মী নিয়োগের সময়ে সাক্ষাৎকার ও (interview) পরীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ;
(g) কর্মীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ;
(h) সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন;
(i) জনসাধারণের অভিযোগ গ্রহণ;
(j) জেলায় সাক্ষরতা প্রসারের কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

এস. আর. মহেশ্বরী যথার্থই বলেছেন যে, জেলাশাসকের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। ওঁর নিজের কথায় "more undefined than defined" (Maheshwari, Indian Administration, p. 552)।

3.5 জেলাশাসক পদের গুরুত্ব

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার ফলে জেলা শাসককে নির্বাচন ভিত্তিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠতে হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী মন্ত্রীরা আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ; কিন্তু আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য হওয়ার দরুণ প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে সচিবদের কর্তৃত্ব। এই জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে জেলাশাসক আজ আর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহীতা নন, সিদ্ধান্ত প্রয়োগকারী মাত্র।

জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণ আর ব্রিটিশ আমলের মতো সহনশীল প্রজা নন। জেলাশাসক সেহেতু শক্তি নয়—সহযোগিতা, ভীতি প্রদর্শন নয়—বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে কাজ করেন। জেলায় রাজনৈতিক দল এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করে তোলায় জেলাশাসককেও জনগণের সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব কমিয়ে গণমুখী হয়ে উঠতে হয়েছে।

এস. আর. মহেশ্বরী তাঁর Indian Administration বইতে (p. 549) ব্রিটিশ আমলের কর্তৃত্বপরায়ণ জেলাশাসক এবং স্বাধীন ভারতের নমনীয় জেলাশাসকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রকৃত্যকের অধীনস্থ জেলাশাসক তাঁর চাকরি জীবনের 12 থেকে 18 বৎসর জেলায় কর্মরত থাকতেন; পক্ষান্তরে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের অধীনস্থ জেলাশাসক 4-6 বৎসর জেলায় অতিবাহিত করেন; ফলে শেষোক্ত ক্ষেত্রে কিছু নির্লিপ্ততা লক্ষ করা যেতে পারে। উপরন্তু, বর্তমানে একজন IAS এর চাকরি জীবনে জেলাশাসকের পদ প্রায় শুরুর মুহূর্তমাত্র ওপরের ধাপে ওঠার মাধ্যম। অতঃপর জেলাশাসক কর্তৃত্বের টানাপোড়েনে বিতর্ক বাড়াতে চান না।

রাজ্য সরকার
↓
মুখ্য সচিব
↓

ডিভিশনাল কমিশনার

↓

জেলাশাসক

↓

সহকারী জেলাশাসক

↓

মহকুমা শাসক

↓

তহশীলদার

↓

নায়েব তহশীলদার

↓

কানুনগো

↓

লেখপাল বা গ্রাম পাটোয়ারি

উক্ত স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে সাধারণত জেলা প্রশাসন পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও অভিজ্ঞ প্রশাসকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হয় নি। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অনমনীয়তার উর্ধ্বে উঠে এবং দলীয় রাজনীতির থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষভাবে জেলার উন্নয়নে যদি জেলাশাসক তাঁর দক্ষতাকে ব্যবহার করেন, তাহলে সাধারণ জনমানসে তার গুরুত্ব কম হবে না।

3.6 সারাংশ

ব্রিটিশ আমলে জেলাশাসক ছিলেন জেলার বাসিন্দাদের মা-বাপ, অভিভাবক। তিনি জেলা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হতেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়েওঠার পর জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জেলাশাসক প্রশাসনিক অধিকর্তা হলেও জেলার সভাধিপতি অধিক গুরুত্বের দাবিদার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা শাসকের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব আজও স্বীকৃত হলেও, উন্নয়নের কাজে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। 1993 ও 1994 সালে সংবিধান সংশোধন করে উন্নয়নের কাজে জেলাশাসকের দায়িত্ব হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়াও কোনো কোনো রাজ্যে অতিরিক্ত বা সহকারী জেলাশাসক নিয়োগ করে জেলাশাসকের কর্মভার লাঘব করা হয়েছে। তথাপি তাঁর পদমর্যাদা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও ব্যক্তিত্ববলে জেলাপ্রশাসনে তিনি নেতৃত্ব দিতে পারেন ও উন্নয়নের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

3.7 অনুশীলনী

1. সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন (✓) (উত্তর সংকেত 41 পৃষ্ঠায়)।

(ক) প্রাচীন ভারতে গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় 'বিষয়' বলতে বোঝাত—
- (i) সম্পদ,
- (ii) গ্রামণী,
- (iii) জেলা,
- (iv) দণ্ডনায়ক।

(খ) 'রাজ্জুক' নামক রাজকর্মচারী দেখতে পাওয়া যায়—
- (i) বৈদিক আমলে,
- (ii) মৌর্য শাসনকালে,
- (iii) ব্রিটিশ আমলে
- (iv) কোনটাই নয়।

(গ) 'সহস্রাধিপের' উল্লেখ পাওয়া যায়—
- (i) যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে,
- (ii) মনু স্মৃতিতে
- (iii) শুক্রনীতি সারে,
- (iv) অর্থশাস্ত্রে।

(ঘ) মোঘল আমলে 'কারোরি ফৌজদার' ছিলেন—
- (i) জেলা কালেক্টর,
- (ii) পঞ্চায়েত প্রধান,
- (iii) মেয়র,
- (iv) কোনটিই নয়।

(ঙ) জেলা কালেক্টরের পদের উৎপত্তি হয়—
- (i) 1772
- (ii) 1773
- (iii) 1781
- (iv) 1793

(চ) 1952 সালে গৃহীত হয়—
- (i) CDP
- (ii) IRDP
- (iii) DWCRA
- (iv) TRYSEM
- (v) SEWA

(ছ) DWCRA—
   (i) কেবল শিশুদের জন্য,
   (ii) বৃদ্ধদের জন্য,
   (iii) যুবতীদের জন্য,
   (iv) মহিলা ও শিশুদের জন্য।

(জ) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (প্রশাসনিক), উন্নয়নের দায়িত্বের ভাগীদার—
   (i) গুজরাটে,
   (ii) পশ্চিমবঙ্গে,
   (iii) উত্তরপ্রদেশে,
   (iv) সব রাজ্যে।

2. দুই-একটি বাক্যে উত্তর দিন।
   (ক) প্রাচীন ভারতে প্রশাসনের বিষয়পতি বলতে কি বোঝাত?
   (খ) সুবেদার কাকে বলা হত?
   (গ) ভারতীয়রা জেলা প্রশাসনে কবে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে?
   (ঘ) 1787 ও 1793 সালে জেলা কালেক্টরের দায়িত্বে কি পরিবর্তন সূচীত হয়?
   (ঙ) সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ববর্তী সময়ে জেলা কালেক্টর কি দায়িত্ব পালন করতেন?
   (চ) জেলাশাসক যে সকল খাতে কর সংগ্রহ করেন তার উল্লেখ করুন।
   (ছ) গ্রামীণ মহিলা, শিশু ও যুবকদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত অন্তত দুটি প্রকল্পের নাম করুন।
   (জ) কোন্ কোন্ রাজ্যে জেলাশাসক জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নন?

3. সংক্ষেপে উত্তর দিন (50টি শব্দের মধ্যে)।
   (ক) 1857 সাল থেকে 1919 সাল পর্যন্ত জেলা কালেক্টরের কি ভূমিকা ছিল?
   (খ) স্বাধীনভারতে জেলাশাসকের ভূমিকার কীরূপ পরিবর্তন ঘটে?
   (গ) রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে জেলাশাসকের কাজ বর্ণনা করুন।
   (ঘ) জেলার মুখ্য প্রশাসনিক অধিকর্তা হিসাবে জেলাশাসক যে সকল দায়িত্ব পালন করেন তার অন্তত পাঁচটি উল্লেখ করুন।
   (ঙ) সমন্বয়কারী হিসাবে জেলাশাসকের ভূমিকার বাস্তবতা সম্বন্ধে লিখুন।
   (চ) সংকট মুহূর্তে জেলাশাসকের ভূমিকা কি?
   (ছ) স্বাধীনভারতে জেলাশাসকের গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখুন।

4. 150টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।
   (ক) ব্রিটিশ শাসনকালে জেলা কালেক্টরের দায়িত্ব ও ভূমিকা কী ছিল?
   (খ) স্বাধীনভারতে জেলাশাসকের পরিবর্তিত অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।
   (গ) জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলাশাসকের ভূমিকা কী?
   (ঘ) জেলার উন্নয়নের সঙ্গে জেলাশাসক কীভাবে জড়িত?

3.8 উত্তর সংকেত

1. (ক) জেলা। (খ) মৌর্য শাসনকালে। (গ) মনুস্মৃতিতে। (ঘ) জেলা কালেক্টর। (ঙ) 1772 সালে। (চ) CDP (ছ) মহিলা ও শিশুদের জন্য। (জ) উত্তরপ্রদেশে।
2. (ক) 3.2 ২য় অনুচ্ছেদ।
   (খ) 3.2 ৩য় অনুচ্ছেদ।
   (গ) 3.2 ৪র্থ অনুচ্ছেদ।
   (ঘ) 3.2 ৪র্থ অনুচ্ছেদ।
   (ঙ) 3.2 ৫ম অনুচ্ছেদ।
   (চ) 3.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'কালেক্টর হিসাবে জেলাশাসক' দ্রষ্টব্য।
   (ছ) DWCRA এবং TRYSEM (সম্পূর্ণ নাম লিখবেন)।
   (জ) মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, (সম্পূর্ণ বাক্যে লিখবেন)।
3. (ক) 3.2 নির্বাচিত অংশ।
   (খ) 3.3
   (গ) 3.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'কালেক্টর হিসাবে জেলাশাসক' দ্রষ্টব্য।
   (ঘ) 3.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'জেলার মুখ্য প্রশাসনিক অধিকর্তা' দ্রষ্টব্য।
   (ঙ) 3.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'সমন্বয়কারী হিসাবে জেলাশাসক' দ্রষ্টব্য।
   (চ) 3.4 এর অন্তর্ভুক্ত 'সংকট কালীন প্রশাসক' দ্রষ্টব্য।
   (ছ) 3.5
4. (ক) 3.2 চতুর্থ অনুচ্ছেদ।
   (খ) 3.3
   (গ) 3.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে জেলাশাসক' দ্রষ্টব্য।
   (ঘ) 3.4 এর অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ 'উন্নয়ন অধিকর্তা' দ্রষ্টব্য।

3.9 গ্রন্থপঞ্জি

1. S.R. Maheswari, Indian Administration, New Delhi, Orient Longman, 1995.
2. R.K. Arora, R. Goyal, Indian Public Administration, New Delhi, Wishwa Prakashan, 1997.
3. Mohit Bhattacharya, Indian Administration, Kolkata, World Press, 2000.
4. S.S. Khera, District Administration in India, Bombay, Asia, 1964.
5. A. Avasthi and R.K. Arora (Ed.), Bureaucracy and Development : Indian Perspectives, New Delhi, Associated Publishing house, 1978.

একক 4 ❑ মহকুমাশাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক

গঠন

4.0 উদ্দেশ্য

4.1 প্রস্তাবনা

4.2 মহকুমা শাসকের নিয়োগ

4.3 মহকুমা শাসকের কাজ ও ভূমিকা

4.4 ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এর ভূমিকা

4.5 বি. ডি. ও. এর কাজ ও দায়িত্ব

4.6 সারাংশ

4.7 অনুশীলনী

4.8 উত্তর সংকেত

4.9 গ্রন্থপঞ্জি

4.0 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে—

- জেলাপ্রশাসন পরিচালনায় মহকুমা শাসক ও বি. ডি. ও. এর কাজ দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে জানা যাবে।
- আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন বনাম রাজনৈতিক গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

4.1 প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলাশাসকের কাজ ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গসহ দু-একটি রাজ্যে উন্নয়নের দায়িত্ব জেলাশাসকের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে তত্ত্বগতভাবে বলা হলেও বাস্তবে জেলার যাবতীয় উন্নয়নে, তাঁর অভিজ্ঞতা, পরামর্শ ও উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। পল. এইচ. এ্যাপেলবীর মতে অতিরিক্ত কাজের চাপ, কম কর্মীসংখ্যা, প্রশাসনিক ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের অভাব জেলাশাসকের অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য (মহেশ্বরী, পৃ: 559)। এহেন সমস্যার মোকাবিলায় 1844 সালে এক একটি জেলাকে কয়েকটি মহকুমায় (sub division) ভাগ করা হয় যার দায়িত্বে থাকেন মহকুমাশাসক। কয়েকটি ব্লক নিয়ে গঠিত হয় একটি মহকুমা এবং কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পড়ে ওঠে একটি ব্লক। ব্লকের প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তথা BDO। এই ক্রমোচ্চস্তর বিন্যাসের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন কী ভাবে পরিচালিত হয় তা বুঝতে গেলে জেলাশাসক (আগের এককে আলোচিত হয়েছে), মহকুমা শাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের ভূমিকাকে জানতে হবে।

4.2 মহকুমা শাসকের নিয়োগ

মহকুমার দায়িত্বভার অর্পিত থাকে মহকুমাশাসকের হাতে। ব্রিটিশ শাসনকালে প্রশাসনের সুবিধার জন্য জেলাকে এক অথবা একাধিক মহকুমায় ভাগ করা হয়। মহকুমাশাসক I.C.S অথবা B.C.S. বা কৃত্যক পরিষেবা থেকে নিযুক্ত হতেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে তরুণ সর্বভারতীয় রাষ্ট্রকৃত্যক আধিকারিককে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজ্য কৃত্যকের ক্ষেত্রে কয়েকবছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হলে মহকুমাশাসক পদে নিয়োগ করা হয়।

4.3 মহকুমা শাসকের কাজ ও ভূমিকা

জেলাশাসকের কাজের সাফল্য নির্ভর করে মহকুমা শাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের সক্রিয় সহযোগিতার ওপর। মহকুমা-স্তরে উন্নয়নের দায়িত্বে থাকেন মহকুমা শাসক। তাঁর এলাকার মধ্যে মহকুমা শাসকের দায়িত্ব জেলাস্তরে জেলাশাসকের মতো। মহকুমা-স্তরে সরকারি কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন মহকুমা শাসক। তিনি জেলাশাসককে সর্বতোভাবে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করেন। জেলা প্রশাসন পরিচালনায় মহকুমা শাসক একজন অপরিহার্য ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হন।

মহকুমা-স্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় দণ্ড বিধি ও code of criminal procedure এর কয়েকটি নির্দিষ্ট ধারা তিনি প্রয়োগ করতে পারেন। প্রারম্ভিককালে তিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করতেন এবং ফৌজদারি মামলা গ্রহণ ও তা বিচারের জন্য অধীনস্থ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করতেন। নির্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র হওয়ার পরে মহকুমাশাসক আর বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন না। তিনি কেবল মাত্র প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট (Executive Magistrate) হিসাবে কাজ করেন। পুলিশি প্রশাসনের কিছু দায়িত্ব তিনি বহন করেন।

মহকুমা শাসক রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে জেলাশাসককে সাহায্য করেন।

তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করেন, জমির সীমানা নির্দেশ ও জমির রেকর্ড তৈরি ও সংরক্ষণ করেন, জমির মূল্য নির্ধারণ, খাজনা স্থিরীকরণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। জমি সংক্রান্ত বিতর্কের নিষ্পত্তিতে তাঁর ভূমিকা থাকে।

তিনি মহকুমার জনস্বাস্থ্য, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন।

তিনি সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের (Community Development Programme) রূপায়ণ ও তার প্রয়োগের তত্ত্বাবধান করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা খরা, বন্যা প্রভৃতি অথবা মানব সৃষ্ট সমস্যা যথা— যুদ্ধ দাঙ্গা ইত্যাদিতে ত্রাণ, পুনর্বাসন ইত্যাদির দায়িত্বে থাকেন।

লাইসেন্স প্রদান করা মহকুমা শাসকের অন্যতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সাধারণ ব্যবস্থা, বন্দুক থেকে বন্দুকের লাইসেন্স প্রদানও এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

মহকুমাস্তরে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাক্রম সম্বন্ধে মহকুমা শাসক জেলাশাসককে অবহিত করেন। তিনি একদিকে জেলাশাসক ও অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতি, B.D.O ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন।

মহকুমা শাসকের ভূমিকা ও দায়িত্ব জেলাশাসকের অনুরূপ বলে তাকে একসময়ে 'Miniature District Magistrate' বা ক্ষুদে জেলাশাসক বলা হত। বর্তমানে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক তাঁর দায়িত্বের কিছু অংশ ভাগ করে নেওয়ায় মহকুমা শাসকের ভূমিকার গুরুত্ব কিয়দংশে হ্রাস পেয়েছে।

4.4 ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের ভূমিকা

স্বাধীন ভারতে জাতি গঠন একটি অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ করতে পারলে সুস্থ সমাজ ও রাজনীতি গড়ে উঠবে এই প্রত্যাশা থেকেই উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 1952 সালে এই লক্ষ্যে গৃহীত হয় Community Development Programme বা সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন যেমন সুবিশাল, বৈচিত্র্য যেমন অগণিত, জনসংখ্যার বিস্ফোরণও তেমনি উদ্বেগজনক। অতঃপর প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থে বিবিধ চাহিদা ও অপ্রতুল সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা ও গ্রামস্তরে বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রচেষ্টা হয়। প্রশাসনিক কাঠামোয় বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে (delegation) উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা হয়।

জেলাকে কয়েকটি মহকুমায় এবং মহকুমাকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে প্রশাসনিক দ্রুততা ও কার্যকারীতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। জেলার দায়িত্ব যেমন থাকে জেলাশাসকের হাতে, মহকুমার দায়িত্ব থাকে মহকুমা শাসকের হাতে, ব্লকের দায়িত্ব তেমনি থাকে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে যে ব্লক গঠিত হয় তার প্রশাসন পরিচালনা, জনসংযোগ রক্ষা, উন্নয়ন প্রকল্পের তদারকি ইত্যাদি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক করে থাকেন।

B.D.O বা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক একজন রাজ্য কৃত্যকের সদস্য। যে ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসে তিনি অবস্থান করেন তা হল—

রাজ্য সরকার
↓
মুখ্যসচিব
↓
জেলাশাসক
↓
মহকুমাশাসক
↓
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO)

4.5 বি ডি ও-এর কাজ ও দায়িত্ব

উন্নয়নমুখী দায়িত্ব

ব্লকস্তরে উন্নয়নে প্রকল্প রূপায়ণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকেন BDO। উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে মুখ্য সমন্বয়কারী হিসাবে তিনি কাজ করেন। উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে হলে স্বাভাবিকভাবেই

তাকে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ, রূপায়ণ, মূল্যায়ন, জেলাশাসক ও জেলাপরিষদকে অবহিত করা ইত্যাদি কাজ করতে হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে একযোগে এই উন্নয়নমুখী কার্যকলাপকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যান। গ্রামীণ উন্নয়নে কৃষি, সমবায়, মৎস, পশুপালন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে, বিভাগীয় অধিকর্তা থাকেন; এঁরা উন্নয়নে পরামর্শদাতা ও প্রকল্প প্রয়োগকারী। BDO সার্বিকভাবে এই বিভাগগুলিকে নেতৃত্ব দেন। এই বিভাগগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্বও তাঁর। এই সকল আধিকারিকরা একদিকে যেমন বিভাগীয় উর্ধ্বতনের কর্তৃত্বাধীন ও কৌশলগত কারণে বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ, অন্যদিকে প্রশাসনিক কার্য নির্বাহের জন্য BDO-এর কাছে দায়িত্বশীল। এই দ্বৈত অবস্থান হেতু উন্নয়নের বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তারা BDO-এর নিয়ন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে BDO-এর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক জটিলতা ও আমলাতান্ত্রিক ঈর্ষাপরায়ণতা হেতু BDOকে অনেক সময়েই এই সকল অধিকর্তাদের কর্মশিথিলতা নিয়ে সমস্যা ভোগ করতে হয়। তপশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বা সেচ, স্থল পরিবহন জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে কর্মতৎপরতা যেহেতু বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেহেতু BDO একে এবিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হতে হয়। 1953 সালে NES পরে IRDP জাতীয় প্রকল্প গৃহীত হওয়ায় উন্নয়নে বি ডি ও এর দায়িত্বও বেড়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির সম্পাদক (Secretary) হিসাবে দায়িত্ব—

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পর্যায়ে ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয় এবং এর সম্পাদকীয় (Secretarial) দায়িত্বে থাকেন BDO। অতঃপর পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং, নথি সংরক্ষণ, বাজেট প্রস্তুত, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রয়োগের প্রতিটি পর্যায়ে BDO এর অবদান অনস্বীকার্য। পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালনায় তার বিশেষ ভূমিকা থাকে। বিভিন্নস্তরের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, পঞ্চায়েত সমিতিতে উত্থাপিত বিরোধের মীমাংসা, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা BDO এর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে BDO এর বিরোধ প্রায়শই লক্ষ করা যায়। এই বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে অর্থ সংক্রান্ত বেনিয়ম দূর করতে গেলে। এর সকল ক্ষেত্রে BDO কে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে হয়। এবং লক্ষ রাখতে হয় যাতে উন্নয়নের কাজগুলি যথাযথভাবে হয় এবং উন্নয়নের সুবিধালাভে পক্ষপাতিত্ব না হয়। ত্রাণ, বন্টন, এলাকাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে BDO একে সমস্ত স্থানীয় চাপের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা উপরমহল থেকে চাপিয়ে না দিয়ে জনসাধারণের দ্বারাই তা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। Watershed Management এ এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সফল। এখানেও জনসাধারণকে উৎসাহিত ও সচেতন করায় পঞ্চায়েত সমিতির সেক্রেটারি হিসেবে BDO এর ভূমিকা থেকে যায়। PRA বা Participatory Rural Appraisal পদ্ধতি অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণের পর্যায় থেকে গ্রাম বা অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে সংযুক্ত করার প্রয়াস করা হয়। পঞ্চায়েত অফিস বা স্থানীয় কোনও ক্লাবঘরে জনসাধারণকে জড়ো করে গ্রামের সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের নানান দিক সম্বন্ধে অবহিত করা এবং প্রকল্প গ্রহণ থেকে শুরু করে তার প্রয়োগ পর্যন্ত নানান পর্যায়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা PRA-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থা যাতে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে প্রকৃত জনস্বার্থে পরিচালিত হয় এবং কৌশল ও নীতিগত দিকগুলি যেন লঙ্ঘিত না হয় তা দেখা ও সে সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করা BDO-এর অন্যতম দায়িত্ব।

4.6 সারাংশ

পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকলাপ তদারকি করার দায়িত্ব BDO-এর ওপর অর্পিত হলেও বর্তমানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের এত কাছে পৌঁছে গেছে যে BDO কে পঞ্চায়েত সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করেই কাজ করতে হয়। উন্নয়নের কাজে, BDO ও পঞ্চায়েত সমিতি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল বলে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠা অত্যন্ত আবশ্যক। BDO কে প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়।

অন্যদিকে উন্নয়নের কাজের সাফল্য নির্ভর করে BDO, মহকুমাশাসক ও জেলাশাসকের মধ্যে সুসম্পর্কের ওপর। তবে অনেকে অভিযোগ করেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অদক্ষতার সুযোগ নিয়ে বিডিও, মহকুমাশাসক ও জেলাশাসক আমলাতান্ত্রিক অনমনীয়তা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। ভ্রষ্টাচার ও কর্মশিথিলতা দমনে এই নিয়ন্ত্রণ কিছুটা প্রয়োজন হলেও জনগণের প্রকৃত স্বার্থরক্ষার দিকে তাকিয়ে বিডিও প্রমুখেরও কাজ করা উচিত।

4.7 অনুশীলনী

I. সঠিক উত্তরটি ✔ চিহ্নিত করুন (উত্তর সংকেত 48. পৃষ্ঠায়)।

(ক) বর্তমানে মহকুমাশাসক—
- (i) বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট,
- (ii) প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট,
- (iii) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট,
- (iv) কোনটাই নয়— হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

(খ) মহকুমাশাসক—
- (i) কেন্দ্রীয় সরকার,
- (ii) রাজ্য সরকার,
- (iii) জেলাশাসক,
- (iv) মুখ্যসচিবের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ রক্ষা করেন।

(গ) সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়—
- (i) 1952
- (ii) 1947
- (iii) 1980
- (iv) 1991

(ঘ) ব্লকস্তরে প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্বাহ করেন—
- (i) মহকুমাশাসক,
- (ii) ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক,

(iii) জেলাশাসক,
(iv) জেলা সভাধিপতি।

(ঙ) বিডিও—
(i) পঞ্চায়েত সমিতির সেক্রেটারি,
(ii) জেলা পরিষদের সেক্রেটারি,
(iii) গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি,
(iv) কোনটাই নয়।

(চ) PRA পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে প্রয়োগের বিভিন্ন ধাপে—
(i) জেলাশাসককে,
(ii) বিডিওকে,
(iii) স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে,
(iv) জনসাধারণকে সংযুক্ত করার জন্য গৃহীত হয়।

(ছ) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন—
(i) ভ্রষ্টাচার দমনের জন্য,
(ii) গণতন্ত্র ধংসের জন্য,
(iii) কেন্দ্রীকরণের জন্য,
(iv) কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য।

2. দুই-একটি বাক্যে উত্তর দিন।
(ক) কবে মহকুমা গঠিত হয়? মহকুমা বলতে কী বোঝায়?
(খ) ব্লক কী ও কে ব্লক স্তরে শাসনবিভাগীয় দায়িত্বে থাকেন?
(গ) মহকুমাশাসককে 'Miniature District Magistrate' বলা হত কেন?
(ঘ) আমলাতান্ত্রিক স্তর বিন্যাসে বি ডি ও এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কে?

3. সংক্ষেপে উত্তর দিন (50টি শব্দের মধ্যে)।
(ক) মহকুমাশাসকের নিয়োগ সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
(খ) বর্তমানে মহকুমাশাসকের পদের গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখুন।
(গ) ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক গ্রামীণ উন্নয়নের দায়িত্ব কীভাবে পালন করেন?

4. 150টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।
(ক) মহকুমাশাসকের কাজ, দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
(খ) পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে বি ডি ও এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।
(গ) বি ডি ও এর কাজের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করুন ও তার মোকাবিলায় বি ডি ও এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

4.8 উত্তর সংকেত

1. (ক) প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট।
   (খ) জেলাশাসক।
   (গ) 1952 সালে।
   (ঘ) ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।
   (ঙ) পঞ্চায়েত সমিতির সেক্রেটারি।
   (চ) জনসাধারণকে সংযুক্ত করার জন্য গৃহীত হয়।
   (ছ) ভ্রষ্টাচার দমন এবং কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য।
2. (ক) জেলাশাসকের অতিরিক্ত কর্মভার লাঘব করার জন্য 1844 সালে মহকুমা গঠিত হয়। একটি জেলাকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়। এই উপবিভাগগুলিকে মহকুমা বলা হয়।
   (খ) কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ব্লক তৈরি হয়। ব্লকস্তরে শাসনবিভাগীয় দায়িত্বে থাকেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO)।
   (গ) মহকুমাস্তরে মহকুমাশাসকের ভূমিকা ও দায়িত্ব জেলাশাসকের অনুরূপ বলে একসময়ে তাঁকে 'Miniature District Magistrate' বলা হত।
   (ঘ) আমলাতান্ত্রিক স্তরবিন্যাসে বি ডি ও এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মহকুমা শাসক, তথা SDO।
3. (ক) 4.2
   (খ) 4.3 প্রথম ও শেষভাগ।
   (গ) 4.5 উন্নয়নমুখী দায়িত্ব।
4. (ক) 4.3
   (খ) 4.5 এর অনুচ্ছেদ 'পঞ্চায়েত সমিতির' সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব।
   (গ) 4.5 এর নির্বাচিত অংশ ও 4.6

4.9 গ্রন্থপঞ্জি

পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একক ১ □ ভারতের পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা প্রশাসন

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার সহায়ক প্রশাসন

১.৪ যোজনা কমিশন (Planning Commission)

১.৫ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council)

১.৬ কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (CAG)

১.৭ ফিনান্স কমিশন (Finance Commission)

১.১ উদ্দেশ্য

এই পাঠ্যক্রম পড়ার শেষে বোঝা যাবে পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার জন্য সহায়ক প্রশাসন, যোজনা কমিশনের গঠন ও কার্য্যাবলী, জাতীয় উন্নয়ণ পরিষদের গঠন ও কার্য্যাবলী, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের ভূমিকা ও কার্য্যাবলী এবং ফিনান্স কমিশনের গঠন ও কার্য্যাবলী।

১.২ প্রস্তাবনা

এখানে মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পনামাফিক উন্নয়নের একান্ত প্রয়োজন। তাই, পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে দুটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখানে আলোচিত হয়েছে : যোজনা কমিশন (Planning Commission) এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council)।

আরও দুটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের আলোচনা এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। একটি কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল এবং আর একটি ফিনান্স কমিশন (Finance Commission)। যোজনা কমিশনের কাজ পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পরিকল্পনার আলোচনা করেন এবং সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনায় সম্মতিজ্ঞাপন করেন। অন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্য্যাবলী সম্পূর্ণ আলাদা। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল সরকারের হিসাব নিকাশ করেন এবং হিসাব পরীক্ষকের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন। ফিনান্স কমিশনের মূল কাজ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক বন্টনের নীতি নির্ধারণ করা।

১.৩ পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার সহায়ক প্রশাসন ঃ

পরিকল্পনার গুরুত্ব ঃ

পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার দ্রুত এবং অভিপ্রেত উন্নয়ন প্রায় সব দেশেই পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর "তৃতীয়" বিশ্বের দেশগুলিও জনগণের কল্যাণমুখী ব্যাপক পরিকল্পনা চালু করেছিল। ভারতবর্ষ এই দেশগুলির অন্যতম; স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন নেতৃত্ব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন যে পরিকল্পনা ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়নসাধন করতে হবে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডি. আর. গ্যাডগিল্ (D. R. Gadgil) পরিকল্পনার প্রয়োজন সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঃ

"অর্থনীতিক উন্নয়ণের জন্য পরিকল্পনা কেন করতে হয় তা বোঝা দরকার। বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ছাড়া উন্নয়নের গতি এবং দিক নির্ণয় কখনই সন্তোষজনক হতে পারে না। ঠিক ঠিকভাবে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করা দরকার, তা হলেই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায় এবং সঠিক পথে পরিচালনা করা যায়। পরিকল্পনার মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের যথাযথ উৎপাদন সম্ভব। প্রযুক্তির ক্রমোন্নতির মধ্যে দিয়ে মূলধন বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হয়। প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে মূলধন ব্যবহারের ব্যাপারে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াতে হয় সুপরিকল্পিত উপায়ে। জাতীয় উৎপাদনের সুষম বন্টন পরিকল্পিত উপায়ে করতে পারলে সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা যায়।"

পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে প্রশাসনের ভূমিকা (Plan Administration) ঃ

শুধু পরিকল্পনা করলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। আসল প্রয়োজন, পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করা, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। যেমন, দারিদ্র দূরীকরণের পরিকল্পনাকে সার্থক করতে গেলে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবার / মানুষকে চিহ্নিত করতে হয়, সেই পরিবার বা মানুষের জমি বা পুকুর, অথবা দক্ষতা কি আছে জানতে হয়, এবং দারিদ্র সীমার উর্দ্ধে তাকে নিয়ে যেতে গেলে কি ধরনের প্রকল্প (যেমন মুরগীপালন বা দর্জির কাজ ইত্যাদি) চালু করতে হয় — এই সমস্ত বিষয় প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন বিভাগকে ভাবতে হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেমন, একটি বিভাগ বাঁধ তৈরী হল, সেই বাঁধের মাটিকে ধরে রাখতে গেলে গাছ-গাছালি লাগাবার কাজ আর একটি বিভাগকে করতে হতে পারে। পরিকল্পনা রূপায়িত করতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক মসৃণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া দরকার। তেমনই নীচুস্তরে রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক সহজ ও সহায়তাপূর্ণ হওয়া দরকার। বিভিন্নস্তরে সরকারের সামর্থ্য ও দক্ষতার উপর পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন নির্ভর করে। চিরাচরিত আমলাতন্ত্র অনেক সময় পরিকল্পনা রূপায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই উন্নয়নমুখী প্রশাসন তৈরীর কথা বলা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে আইন-কানুন, নিয়ম-নিষ্ঠা থেকেও জোর দেওয়া হয় ফলাফলের উপর এবং সরকারী কর্মচারীদের উন্নয়ন মনস্কতার উপর। বিভিন্ন প্রকল্প তৈরী করা, জনগণের সহায়তায় সমীক্ষা করা এবং প্রকল্পের রূপ দেওয়া, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পকে কার্যকরী করা এবং পরিকল্পিত ফলাফল ও অর্জিত ফলাফলের তুলনার মাধ্যমে প্রকল্পের যথাযথ পরিবর্তন করা — এই সমস্তই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিকল্পনা শুধুমাত্র কাগজে কলমে থেকে যায়, আসলে কার্যকরী হয়

না, যদি না কর্মকুশল, সহমর্মী, গণমুখী প্রশাসন তৈরী করা যায়। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে সুরু হওয়ার সময় থেকেই বলা হয়েছে : প্রশাসনিক দক্ষতা ও মানসিকতার উপর পরিকল্পনার সফল রূপায়ন নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবে প্রশাসনের মধ্যে এইসব গুণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে; তার ফলে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন বিঘ্নিত হয়েছে।

১.৪ যোজনা কমিশন (Planning Commission)

কাজকর্ম ও গঠন :

ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সর্বোচ্চ সংস্থা পরিকল্পনা কমিশন। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রস্তাবে এই কমিশন গঠিত হয়। এই সংস্থার মূল কাজকর্মগুলি হল :

১) দেশের উপকরণসমূহের সবচেয়ে কার্যকর ও ভারসাম্যসহ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহ রচনা করা।

২) পরিকল্পনাতে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করা।

৩) দেশের উপকরণগুলির পরিমাপ করা এবং তাদের বাড়ানোর ব্যবস্থা করা।

৪) পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার উপযোগী সর্বোত্তম উপায় খোঁজা, সবচেয়ে বেশি কার্যকর সংস্থা গড়ে তোলা।

৫) কিছুকাল অন্তর অন্তর পরিকল্পনার অগ্রগতির মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনমত অদলবদল করা।

এই মূল দায়িত্বগুলিকে স্মরণে রেখে কমিশনের কাজগুলিকে বিভিন্নভাবে সাজানো যায়, যা আমাদের কমিশন সম্পর্কে এক সুনির্দিষ্ট আভাস দেয়। এগুলি হল :

১) উপকরণগুলির অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন ,

২) উপকরণের নিয়োগ বিন্যাসে অগ্রাধিকার নির্ণয়,

৩) পরিকল্পনা রচনা করা,

৪) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প রচনা করা,

৫) শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা করা,

৬) পরিকল্পনা কার্যকর করে তোলার উপযোগী সংস্থা গড়ে তোলা,

৭) কিছুদিন পরে পরেই পরিকল্পনার অগ্রগতি মূল্যায়ন করা ,

৮) দূরপ্রসারী পরিকল্পনা রচনা করা,

৯) জাতীয় উন্নয়নে জন-সহযোগিতা সুনিশ্চিত করা, ও

১০) 'যোজনা' নামে পত্রিকা প্রকাশ করা।

পরিকল্পনা কমিশনের জন্মলাভের সময়েই ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল যে এটি কোন চিরাচরিত ধরনের বিধিবদ্ধতা অবলম্বন করবে না, বা এটিকে কোন মন্ত্রীদফতর অথবা সরকারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। সরকারী বিভাগে যে দীর্ঘসূত্রিতা, যে গতানুগতিকতা থাকে তা থেকে একে দূরে রাখা হবে। তাছাড়া কোন একটি বিভাগের এটি বিষয় নয়, এটি সর্ববিভাগীয় বা সকল বিভাগের উর্দ্ধে অবস্থিত, একটি supra-department বলে একে গণ্য করা হয়েছিল। সর্বদা পরিবর্তনশীল নানা প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী নমনীয়তা রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ সংগঠন যাতে অনেকটা গতিশীল থাকে, তার জন্য এমন একটি সংগঠন গড়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই সংগঠনের নামই পরিকল্পনা কমিশন। যেহেতু সরকারী বিভাগে এই নমনীয়তা আসে না, তাই বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সুউচ্চ আধার রূপে সরকারী বিভাগের বাইরে এই স্বাধীন কমিশনের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

গঠন ঃ ১৯৫০ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকে কমিশনের নানাদিকে পরিবর্তন এসেছে। যেহেতু প্রথম থেকেই একটা ধারণা ছিল যে সরকারী দফতরগুলির চেয়ে এর কাজ হবে কিছুটা ভিন্নরকম, তাই এর অভ্যন্তরীণ সংগঠনও ছিল ভিন্নরূপ। কমিশনের কাজের দুটি দিক ঃ প্রশাসন ও পরিকল্পনা। দৈনন্দিন চিরাচরিত প্রশাসন ও সংযোগসাধনের কাজটা ছিল আন্ডার সেক্রেটারিদের হাতে (Under Secretary, Administration and Co-ordination)। কিন্তু পরিকল্পনা প্রণয়নের আসল কাজগুলির জন্য ছিল ডিভিশন (Division)। কমিশনের তিন ধরনের ডিভিশন বা বিভাগের প্রয়োজন হয়, যেমন ঃ

ক) **সাধারণ পরিকল্পনা বিভাগ** (General Planning Division) ঃ এর কাজ হল দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ, গবেষণা; যার সাহায্যে প্রতিটি ক্ষেত্র ও উপক্ষেত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

খ) **বিশেষ পরিকল্পনা বিভাগ** (Special Planning Division) ঃ এই বিভাগের কাজ হল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ও অনুশীলন এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গ) **প্রকল্প প্রশাসন বিভাগ** (Programme Administration Division) ঃ এই বিভাগ বিস্তারিত প্রকল্প রচনা ও তার রূপায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকে। বিশেষত রাজ্যের প্রকল্প রচনায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে পরিকল্পনা কমিশন হল এমন একটা সংগঠন যার বিশেষজ্ঞ সুলভ চরিত্রটি (Expert Character) স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়। এর অভ্যন্তরীণ সংগঠন দুটি সর্বোচ্চ শ্রেণীর পদাধিকারী গোষ্ঠীকে (Hierarchy) ঘিরে গড়ে উঠেছে। এদের এক দল প্রশাসক শ্রেণী বলে পরিচিত, আর অপর দলটি প্রযুক্তিবিদ্‌দের নিয়ে গঠিত।

প্রথম দলে রয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের সেক্রেটারী (Secretary), যাঁর আসন সংস্থাটির চূড়ায় অবস্থিত। তাঁর অধীনে ক্রমানুসারে রয়েছেন জয়েন্ট সেক্রেটারীগণ (Joint Secretaries), ডেপুটি সেক্রেটারীগণ (Deputy Secretaries), আণ্ডার সেক্রেটারীগণ (Under Secretaries) এবং আরও অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীবৃন্দ।

অপরদিকে এই সংস্থার প্রযুক্তিবিদ্‌দের অভিজাত শ্রেণীটি গড়ে উঠেছে উপদেষ্টাদের নিয়ে, যাঁরা নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট নিজ নিজ মতামত জানান। উপদেষ্টা নামে অভিহিত পদাধিকারী ব্যক্তি অতিরিক্ত সেক্রেটারী (Additional Secretary) অথবা জয়েন্ট সেক্রেটারী (Joint Secretary) পদের পর্যায়ভুক্ত হন। এঁদের কাজের প্রকৃতি হল পরিকল্পনা রচনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন। উপদেষ্টার অধীনে একজন 'চীফ' (Chief) নামে অভিহিত পদাধিকারী ব্যক্তি আছেন। চীফের কাজ হল তাঁর কাজের পরিধির মধ্যে অবস্থিত সমস্ত প্রকল্পের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও সেগুলির প্রযুক্তিগত পরীক্ষণ। ডাইরেক্টর (Director), জয়েন্ট ডাইরেক্টর (Joint Director) এবং অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীবৃন্দ 'চীফ' কে তাঁর কাজে সহায়তা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই যে এখানে সাংগঠনিক কাঠামো নমনীয় (flexible), 'উপদেষ্টা' সরাসরি তাঁর অধীনে একজন 'জয়েন্ট ডাইরেক্টর' নিয়ে কাজ করতে পারেন। তাঁর 'চীফে'র বা ডাইরেক্টরের প্রয়োজন নাও হতে পারে।

প্রযুক্তিবিদ্‌দের সর্বোচ্চ সম্প্রদায়টি গড়ে ওঠে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে, যেমন অর্থনীতিবিদ্, যন্ত্রবিদ বা বাস্তুকার (Engineer), পরিসংখ্যানবিদ্ (Statistician) প্রভৃতি। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেষ্টা মণ্ডলীর কাউকে সাধারণ প্রশাসনিক সেবাক্ষেত্র (Generalist Administrative Service) অর্থাৎ ভারতীয় প্রশাসনিক সেবাক্ষেত্র (Indian Administrative Service) থেকে নেওয়া হয়ে থাকে। তবে বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই হলেন অর্থনীতিবিদ্। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় অর্থনৈতিক কৃত্যক বা সেবাক্ষেত্রের (Indian Economic Service) অর্থনীতিবিদ্‌দের সংখ্যাধিক অংশের একক নিয়োগকারী হল পরিকল্পনা কমিশন।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয় ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক বা সেবাক্ষেত্র (Indian Administrative Service) ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় কৃত্যক বা সেবাক্ষেত্র যেমন ভারতীয় হিসাব ও গণনা কৃত্যক বা সেবাক্ষেত্র (Indian Audit and Accounts Service), ভারতীয় রাজস্ব কৃত্যক বা সেবাক্ষেত্র (Indian Revenue Service), কেন্দ্রীয় সচিবালয় কৃত্যক বা সেবাক্ষেত্র (Central Secretariat Service) প্রভৃতি থেকে।

এই সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রকে একত্রিত করলে দেখা যায় যে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মীর সংখ্যা কেশ কয়েক হাজার। এদের মধ্যে আছেন আধিকারিক এবং করণিক (Clerical) ও আরও নিম্ন পর্যায়ের কর্মীগণ।

পরিকল্পনা কমিশনের কার্য সম্পাদনের প্রধান একক (Major Functional Unit) হল এক একটি বিভাগ বা ডিভিশন (Division)। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের ১৯টি বিভাগ রয়েছে, এদের প্রত্যেকটিই পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ এক একটি অংশের কাজ সম্পাদন করে থাকে। এই বিভাগগুলি তাদের নিজ নিজ অংশের কাজ করে সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এরই ফলস্বরূপ রচিত হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এক একটি বিভাগের শীর্ষে যে উপদেষ্টা বা চীফ্ থাকেন তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন।

বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের আভ্যন্তরীণ সংগঠনটি কতগুলি নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত এক বিশেষজ্ঞ দল এই নীতিগুলি আরোপের সুপারিশ করেন। নীতিগুলি হল ঃ

১। পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগগুলির বিভাজন আরও বেশি সুসংগত ও সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।

২। বিভাগগুলিকে এমনভাবে শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে প্রত্যেক বিভাগ দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রগত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে সমর্থ হয়, প্রকল্প প্রস্তুতি ও তার মূল্যায়নে সক্রিয় হতে পারে, পরিকল্পনা রূপায়ণে সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিতে পারে এবং তাদের কাজকর্মের সংবাদ ও তথ্যাদি সরবরাহে উন্নত হতে পারে।

৩। সেবা বিভাগে (Servicing Division) প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ রাখা প্রয়োজন যাতে প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্পের প্রতি সজাগ দৃষ্টিদান, প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ এবং প্রকল্পগুলির পশ্চাৎ-সমর্থন সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের যে ১৯টি বিভাগ রয়েছে সেগুলি হল ঃ

১। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ (Agriculture and Rural Development Division)

২। অর্থনৈতিক, রাজস্ব ও সম্পদ বিভাগ (Economic, Finance and Resources Division)

৩। শিক্ষা বিভাগ (Education Division)

৪। কর্মসংস্থান ও মানবশক্তি বিভাগ (Employment and Manpower Division)

৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (Health and Family Welfare Division)

৬। আবাসন, নগর উন্নয়ন এবং জল সরবরাহ বিভাগ (Housing, Urban Development and Water Supply Division)

৭। শিল্প ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (Industry and Mineral Division)

৮। জলসেচ ও কর্তৃত্বাধীন এলাকা উন্নয়ন বিভাগ (Irrigation and Command Area Development Division)

৯। ভূমি সংস্কার বিভাগ (Land Reforms Division)

১০। সতর্ক দৃষ্টিদান ও তথ্যাদি জ্ঞাপন বিভাগ (Monitoring and Information Division)

১১। দূরপ্রক্ষিপ্ত পরিকল্পনার রূপরেখা প্রদান বিভাগ (Perspective Planning Division)

১২। পরিকল্পনা সমন্বয় বিভাগ (Plan Coordination Division)

১৩। পরিকল্পনা তথ্যাদি ও জন-সহযোগ বিভাগ (Plan Information & Public Cooperation Division)

১৪। কর্মসূচী প্রশাসন বিভাগ (Programme Administration Division)

১৫। বিদ্যুৎ ও শক্তি বিভাগ (Power and Energy Division)

১৬। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ (Scientific Research Division)

১৭। সামাজিক কল্যাণ বিভাগ (Social Welfare Division)

১৮। পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা বভাগ (Statistics and Survey Division)

১৯। পরিবহন ও যোগাযোগ বিভাগ (Transport and Communications Division)

১৯৫২ সাল থেকে পরিকল্পনা কমিশনে 'কর্মসূচী উপদেষ্টা' (Programme Advisers) নামে পদাধিকারী কিছু ব্যক্তি কাজ করে আসছেন। এই পদাধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন উচ্চ পদাধিকারী আধিকারিক সাধারণত অতিরিক্ত সেক্রেটারি (Additional Secretary) পর্যায়ের হয়ে থাকেন। এই পদাধিকারী ব্যক্তির অপরিহার্য কাজ হল পরিকল্পনা কমিশন এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা। দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের ভার এঁদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। এক একজন কর্মসূচী উপদেষ্টার হাতে একাধিক রাজ্যের ভার অর্পণ করা হয়। তাঁদের আসল ভূমিকা হল রাজ্যে উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের মূল্যায়ন এবং রাজ্যগুলির বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ব্যাপারে রাজ্যগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনকে উপদেশ দান।

সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের সম্পর্ক

পরিকল্পনা কমিশনের জন্ম লাভের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারম্যান পদ এই সংস্থার প্রতিপত্তি বাড়িয়েছে এবং এর কাজে সমন্বয় সাধনেও সহায়তা করেছে অনেক বেশি। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী কমিশনের কেবলমাত্র সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভাগুলিতেই উপস্থিত থাকেন। তবে তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজের সময়ের কিছুটা এই সংস্থার জন্য বরাদ্দ করে থাকেন। এর ফলে যখনই মন্ত্রিপরিষদের সামনে বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তখন প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত জানাতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা কমিশনের দৈনন্দিন কাজকর্ম ডেপুটি চেয়ারম্যানের (Deputy Chairman) নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মতে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠান উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। ১৯৬৭ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (Administrative Reforms Commission) এর রিপোর্টেও বলা হয়েছে যে, পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান পদ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সংযোগ ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এও ঠিক যে এই সংস্থার কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই যোগাযোগ তখনই সম্ভব যখন কমিশনের আলোচ্য সকল বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে সবসময় ওয়াকিবহাল রাখা হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের একেবারে প্রারম্ভে মন্ত্রিসভার সঙ্গে কমিশনের সেতুবন্ধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা পূর্ণ সময়ের কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। কমিশন গঠিত হবার তিন মাসের মধ্যে কমিশনের একজন সদস্যকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়। সেই সময় থেকেই এটা প্রথায় পরিণত হয়েছে যে অর্থমন্ত্রী কমিশনের অন্যতম প্রধান সদস্য হবেন। এই প্রথানুসারে বর্তমানে অর্থমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। অনুরূপভাবে ১৯৫১ সালে তদানীন্তন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরে নেওয়া হয় এবং তিনিও মন্ত্রী থাকাকালীনই ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান

পদে আসীন থাকেন। এই সময় আরও একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পরিকল্পনার জন্য পৃথক দপ্তর গঠন করা হোক এবং ঐ দপ্তরের জন্য পৃথক মন্ত্রী নিয়োগ করা হোক। এই পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রীই পরিকল্পনা কমিশনের মুখপাত্র হিসেবে পার্লামেন্টে কমিশনের কাজকর্মের ব্যাপারে জবাব দেবেন। সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ডেপুটি চেয়ারম্যানকেই পরিকল্পনা দপ্তরের ভার দিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী করা হয়। অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদেরও মাঝে মাঝে বিশেষ বিবেচনাধীনে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে এবং এখনও করা হয়ে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীরাও নিজ নিজ যোগ্যতার গুণে অথবা বিশেষ কারণে অথবা তাঁদের দপ্তরের প্রয়োজনে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হয়ে থাকেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৬ সাল থেকে এই সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পদাধিকার বলে কমিশনের সদস্য পদ দেওয়া হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ণ সময়ের সদস্যদের সংখ্যা সাধারণত তিন থেকে সাতের মধ্যে ওঠানামা করে থাকে। এই পূর্ণ সময়ের সদস্যপদ পান এমন সব ব্যক্তিরা যাঁরা মূলত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কমিশন যখন গঠিত হয় তখন এমন দুজন সদস্যকে পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়, যাঁদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে যখন পরিকল্পনা কমিশনের জন্ম হয় তখন থেকেই পূর্ণ সময়ের সদস্যদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পর্যায়ে একই হারে বেতন, ভাতা, ভ্রমণভাতা, দৈনন্দিন ভাতা ও আবাসন ভাতা প্রভৃতি দেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালের মে মাসে জনতা সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই কমিশনের চেয়ারম্যান পদে আসীন থাকেন। তিনি ছাড়া আরও তিনজন মন্ত্রীকে কমিশনের সদস্যপদ দেওয়া হয়। এই তিনজন মন্ত্রী হলেন - অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এঁদের সকলকেই আংশিক সময়ের সদস্যপদ দেওয়া হয়। ডেপুটি চেয়ারম্যান ও আরও তিনজনকে পূর্ণ সময়ের সদস্য হিসেবে নেওয়া হয়। ডেপুটি চেয়ারম্যান হলেন একজন অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য তিনজনের প্রথমজন হলেন একজন কৃষি-অর্থনীতিবিদ, দ্বিতীয়জন হলেন ব্যবসায় ও শিল্পে অভিজ্ঞ রাসায়নিক বাস্তুকার (Chemical Engineer) এবং তৃতীয়জন কৃষি-প্রশাসনে বিশেষজ্ঞ একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভেন্ট (a retired civil servant with specialiesd knowledge in agri-cultural administration)। ডেপুটি চেয়ারম্যানের মাসিক বেতন হল ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান এবং তিনি পদমর্যাদায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল্য। অন্যান্য সদস্যরা রাষ্ট্রমন্ত্রীর সমান বেতন পান এবং তাঁরা পদমর্যাদায় রাষ্ট্রমন্ত্রীর সমতুল্য।

পরিকল্পনা কমিশন হল একটি যৌথ সংস্থা (Collegiate Body)। কমিশন সকল সদস্যদের নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বৈঠকে বসে। এই বৈঠকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও পূর্ণ সময়ের সদস্যদের উপস্থিতিতে এই সংস্থাটির কাজকর্মের পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে পথ-নির্দেশিকা প্রদান করা হয়। এই ধরেনর বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী — যিনি এই সংস্থার চেয়ারম্যান। এছাড়া সংস্থাটির দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশোনা করেন সংস্থার পূর্ণ সময়ের সদস্যরা। ডেপুটি চেয়ারম্যানকে পরিকল্পনা সমন্বয়, সাধারণ প্রশাসন, আর্থিক সম্পদ, আর্থিক নীতি,, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন, প্রকল্প প্রশাসন, শিক্ষা, সামাজিক পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, আবাসন, নগর উন্নয়ন এবং জন-সহযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য তিনজন সদস্যদের মধ্যে একজনকে তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি, পরিসংখ্যান, আপাত দৃষ্টিগোচর পরিকল্পনা, মানব সম্পদ পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান ও শ্রম প্রভৃতি বিষয় দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়জনের ওপর শিল্প, খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ ও শক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ, গবেষণা ও উন্নয়ণ এবং প্রকল্প মূল্যায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আর তৃতীয় জনের ওপর কৃষি, সেচ এবং গ্রামীণ উন্নয়ণ, গ্রামীণ শিল্প, পরিকল্পনা রূপায়ণ, বহু স্তরীয় পরিকল্পনা, পাহাড়ী ও উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় দেখাশোনার দায়িত্ব থাকে। পূর্ণ সময়ের সদস্যরাই কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কমিশনের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করেন। সমস্ত ক্যাবিনেট মিটিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান আহূত হয়ে থাকেন। প্রয়োজনে কমিশনের অন্যান্য পূর্ণ সময়ের সদস্যরাও ক্যাবিনেট মিটিং-এ অথবা ক্যাবিনেট কমিটির সভায় উপস্থিত থাকেন।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রক হল একটি ছোট সংস্থা যার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে এবং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া রয়েছেন পরিকল্পনা দপ্তরের একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। ইনি অবশ্য কমিশনের সদস্য নন। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে পরিসংখ্যান বিভাগকে (Department of Statistics), যেটি ক্যাবিনেট সচিবালয়ের একটি অংশ ছিল মাত্র, পরিকল্পনা মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, পরিকল্পনা কমিশন হল সরকারের একটি উপদেষ্টা সংস্থা (Advisory Body)। এটিই সরকারকে নতুন নতুন নীতি নির্ধারণ ও প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয় বা সুপারিশ করে। এছাড়া সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে আসা নীতিসমূহ ও প্রকল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। কার্যত অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন দেশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

তবে পরিকল্পনা কমিশন কোন সাংবিধানিক বা বিধিবদ্ধ সংস্থা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কার্যনির্বাহী আদেশের (Executive Order) ওপরেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক বিশেষত অর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে এর প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমূহের ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার মতো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

মূল্যায়ন ঃ পরিকল্পনা কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যপরিধির প্রভাবের ব্যাপারে দুধরনের মত পোষণ করা হয়ে থাকে। একজন সমালোচক মনে করেন যে পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহ হল কেন্দ্রীয় সরকারের নানা মন্ত্রকের সিদ্ধান্তসমূহের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু অপর একদল সমালোচক মনে করেন যে পরিকল্পনা কমিশন হল সরকারের 'সুপার ক্যাবিনেট' (Super Cabinet)। এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবে কার্যকর করার কার্যালয়গুলি হল সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক। তবে পরিকল্পনা কমিশন সম্বন্ধে দ্বিতীয় দলের সমালোচনা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা কোনমতেই সরকারের সুপার ক্যাবিনেট নয়, বরং একে আর্থিক ব্যাপারে ক্যাবিনেটের উপ কমিটি (Sub-committee)বলা যেতে পারে।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, কেন্দ্র ও রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ কমিশনের (Finance Commission) কার্য পরিধির মধ্যে অনেক সময় অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অর্থ কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা হলেও পরিকল্পনা

কমিশনের কাজকর্ম এর কাজের গুরুত্বকে মলিন করে দেয়। চতুর্থ অর্থ কমিশন মন্তব্য করেছে যে, "It is the setting up of the Planning Commission that has in practice restricted the scope and functions of the Finance Commission."[1]

পরিকল্পনা কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আর ও বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমত, পরিকল্পনা কমিশনে প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তিকে সাংবিধানিক দিক থেকে অনুচিত বলে গণ্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা কমিশন হল এমন একটি সংস্থা যা নিজ কৃতকর্মের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এর কার্য সম্পাদনের ধারা ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়ত, সাংগঠনিক দিক থেকেও এই নমনীয়তার অপব্যবহার ঘটানো হয়ে থাকে। কমিশন নিজেই পারকিন্সন আইনের শিকার (Victim of Parkinson's Law)। এই সংস্থার কর্মচারীর সংখ্যা হল ১১৫০। বর্তমানে এই সংখ্যা হয়েছে আরও বেশী। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই সংস্থার জন্য বার্ষিক ব্যয় হয়েছিল ৪ কোটি টাকারও বেশী।

চতুর্থত, কমিশনের কাজকর্মে অত্যধিক কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চমত, এটি নিজেকে এখনও পর্যন্ত একটি বলিষ্ঠ ও সত্য সত্যই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত সংস্থা হিসেবে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়নি।

ষষ্ঠত, পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক কল্যাণের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক পরিকল্পনা কমিশনকে অর্থনৈতিক বিষয়ে সমন্বয়-সাধনের একটি সংস্থায় পরিণত করেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণের প্রাথমিক দায়িত্ব হল অর্থ মন্ত্রকের। সুতরাং মাঝে মাঝেই পরিকল্পনা কমিশনের কাজ অর্থমন্ত্রকের কাজের ওপর আংশিক আবরণ টেনে দেয়।

যাই হোক, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সংস্থাটির অধোগতি শুরু হয়েছে। এটি একটি অনমনীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে পরিকল্পনায় যে উন্নয়নের হার অর্জনের লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয়, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক কম উন্নয়নের হার অর্জিত হয়।

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলী ও গঠন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে যে সব সুপারিশ করেছেন, সেগুলি হল ঃ

প্রথমত, ভারত সরকারের ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের যে সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার কিছুটা পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনের কাজ কেবল মাত্র দীর্ঘমেয়াদী আপাত দৃষ্টি গোচর পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা এবং পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে সফলতা ও অসফলতার মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। শাসন সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে এর জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টে প্রতি বছর পরিকল্পনা রূপায়ণের অগ্রগতি সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের একটি রিপোর্ট পেশ করা উচিত।

---

1. Report of the Fourth Finance Commission, pp 88.

তৃতীয়ত, পরিকল্পনা কমিশনের একটি অ-বিধিবদ্ধ উপদেষ্টা সংস্থা হিসেবেই থাকা উচিত। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করা উচিত।

চতুর্থত, পরিকল্পনা কমিশনের কাজকর্মের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর আন্তরিক সম্পর্ক থাকা উচিত, কিন্তু কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে কোনোমতেই থাকা উচিত নয়। কমিশনের উচিত তার কাজকর্মের সব খুঁটিনাটি প্রধানমন্ত্রীকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জানানো। প্রধানমন্ত্রী কমিশনের যে কোনো বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন এবং বক্তৃতাও দিতে পারেন। যখনই প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠকে যোগ দেবেন তখনই তিনি সেই বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন।

পঞ্চমত, অর্থমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকবেন এবং তিনিও পরিকল্পনা কমিশনের কাজকর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল থাকবেন। তিনি কমিশনের সভায় যোগদান করতে পারবেন। তবে তিনি কমিশনের সদস্য হবেন না।

ষষ্ঠত, মন্ত্রীদের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য করা উচিত নয়।

সপ্তমত, পরিকল্পনা কমিশনের কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী নজর দেবেন। কিন্তু বিশেষ কোন বিষয়ে দেখাশোনার দায়িত্ব থাকা উচিত বিষয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর ওপর।

অষ্টমত, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য সংখ্যা কোনো ক্রমেই সাতের বেশী হওয়া উচিত নয়, এবং কমিশনের সদস্যদের নির্বাচন করা উচিত তাঁদের জ্ঞানের বিশেষত্ব ও অভিজ্ঞতার মাপ কাঠিতে। যদিও পূর্ণ সময়ের সদস্যদের নিয়েই কমিশন গঠন করা উচিত তবুও কখনো কখনো দেখা যায় সদস্যরা যাঁরা কমিশনে যোগদান করতে রাজী হন তাঁরা মাত্র আংশিক সময়ের জন্যই কাজ করতে রাজী হন।

নবমত, সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য নিয়োগ করা উচিত এবং এই মেয়াদকাল অন্তত পাঁচ বছর হওয়া প্রয়োজন। তবে কাজের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য দুই-একজন সদস্যের মেয়াদকাল দুই এক বছর বাড়ানো যেতে পারে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সদস্যদের পুনর্নিয়োগও করা যেতে পারে।

দশমত, সদস্যদের মধ্যে কাজের দায়িত্বের বিভাজন হওয়া উচিত সদস্যদের জ্ঞানের বিশিষ্টতা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত সামগ্রিক ভাবে।

এছাড়া আরও যেসব সুপারিশ উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে, কমিশনের 'সেক্রেটারী'কে কোন বিশেষ কেন্দ্রীয় কৃত্যক থেকে নিয়োগ না করে বিশিষ্ট কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে ঐ পদে আসীন করা প্রয়োজন। পরিচালনা কমিশনের কার্যাবলীর আরও সরলীকরণ দরকার এবং কমিশন কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের ব্যাপারে মন্ত্রকের ওপর কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হয়ে মন্ত্রকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনুশীলনী

১) পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

২) পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলী আলোচনা কর। (কমিশনের গঠন সংক্ষেপে আলোচনা করে এর কাজকর্মের উল্লেখ কর।)

৩) পরিকল্পনা কমিশনের অন্তর্গত ১৯ টি বিভাগ কি কি?

৪) পরিকল্পনা কমিশনের গঠন / কাঠামো কি প্রকার ?

৭) পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে মন্ত্রিসভার কি সম্পর্ক? (কি ভাবে কমিশনের জন্মলাভের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ঠিক কি কাজ করেন?)

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

ক) পরিকল্পনা কমিশন কবে ও কিভাবে গঠিত হয়?

খ) পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান কে?

গ) পরিকল্পনা কমিশনের দৈনন্দিন কাজকর্ম কার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়?

ঘ) পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ণ সময়ের সদস্য সংখ্যা কত ও তাঁরা কারা?

ঙ) কোন সালে এবং কোন সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠিত হয়?

চ) বর্তমানে কোন কোন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য?

একক ২ □ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ (National Development Council)

২.১ উদ্দেশ্য

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের কাজে সহায়তা করবার জন্য বা কোন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য কোনরকম সংবিধান সম্মত সংস্থা ছিল না। অথচ জাতীয় স্তরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত স্বশাসিত অঙ্গরাজ্যগুলির কর্মসূচী ও নীতিসমূহের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচী ও নীতিসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জাতীয় সংস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, যা জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনকে এক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে কে. সি নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি পরামর্শদানমূলক পরিকল্পনা বোর্ড (Advisory Planning Board) গঠন করা হয়েছিল। উক্ত বোর্ড পরিকল্পনা কমিশনকে তার কার্য সম্পাদনে ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সহায়তা করবার জন্য একটি পরামর্শদানমূলক সংস্থা (Consultative Body) গঠনের পরামর্শ দিয়েছিল। এই পরামর্শদানমূলক সংস্থা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। পরবর্তীকালে পরিকল্পনা কমিশন নিজেও এই ধরনের একটি সংস্থার প্রয়োজন বোধ করেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫১ সালের জুলাই মাসের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, যার খসড়া রূপরেখায় বলা হয়েছিল যে ভারতের মত বিশাল দেশে, যেখানে সংবিধান অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে, একটি জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের প্রয়োজন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা সময়ে সময়ে পরিকল্পনা ও তার বিভিন্ন দিক সমীক্ষা করতে পারবেন। কার্যত ভারত সরকার এই পরামর্শ তথা প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল এবং ১৯৫২ সালের ৬ই আগষ্ট জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ জন্মগ্রহণ করেছিল।

গঠন ঃ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ কাঠামোগত দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী, অর্থ, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও খাদ্যমন্ত্রীদের এবং অঙ্গরাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন এই পর্ষদের সভাপতি। কোন মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সভায় আসতে না পারলে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন। পর্ষদের আলোচনার তালিকাভুক্ত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীও আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পাবেন। এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্‌রা ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও পর্ষদের সভাতে ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ পেতে পারেন। প্রারম্ভিক পর্বে ভারতবর্ষে রাজ্যের সংখ্যা বেশী ছিল বলে পর্ষদের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫০ জনে গিয়ে পৌঁছেছিল। পরবর্তীকালে রাজ্য পুনর্গঠনের সুবাদে রাজ্যগুলির সংখ্যা লক্ষ্যনীয়ভাবে হ্রাস পায় এবং তা গিয়ে ৩০ জনে দাঁড়ায়। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে ন'জন মুখ্যমন্ত্রী এবং কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) গঠন করা হয়। পর্ষদ মাঝে মাঝেই নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য বা পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কমিটি গঠন করে থাকে। যেমন, ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিটি গঠন করেছিল। পরিকল্পনা কমিশনের সচিবই উন্নয়ন পর্ষদের সচিব হয়ে থাকেন।

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ সাধারণত বছরে দুবার সভায় মিলিত হয়ে থাকে। অবশ্য এ বিষয়ে তেমন কোন নির্ধারিত নিয়ম কানুন নেই। বছরে দুবারের অধিক সময়ও পর্ষদ মিলিত হতে পারে, যদি তা প্রয়োজন হয়। ১৯৬০

সাল পর্যন্ত পর্ষদ মোট ১৬ বার অধিবেশনে মিলিত হয়েছিল। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের আলোচ্য তালিকা বা এজেন্ডা পরিকল্পনা কমিশনের সচিব প্রস্তুত করে থাকেন। সাধারণত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই পর্ষদের আলোচনায় স্থান পেয়ে থাকে। পর্ষদের সচিব আলোচ্য বিষয়ের উপর স্মারকপত্র প্রস্তুত করে থাকেন এবং তা পর্ষদের সহ-সভাপতির হাতে, প্রধানমন্ত্রী তথা সভাপতির হাতে অনুমোদনের জন্য দেন। প্রধানমন্ত্রী তথা সভাপতির অনুমোদন পাবার পর আলোচ্য বিষয়বস্তু বা এজেন্ডা পর্ষদের সকল সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এরপর সভাপতির স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সভা শুরু হয়ে থাকে।

কার্যাবলী : পরিকল্পনা কমিশনের কার্যে সহায়তা করবার জন্য ১৯৫২ সালে পরিকল্পনা কমিশন আবার একটি সংবিধান বহির্ভূত সংস্থা সৃষ্টি করেছিল, যার নাম জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ। এই পর্ষদটি মূলত সমগ্রদেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুসম ও দ্রুত উন্নয়ন আনবার জন্য, রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের পরিকল্পনা কার্যে সহায়তা প্রদান করবার জন্য এবং পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করবার জন্য জন্মলাভ করেছে। কিন্তু বাস্তবে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ এইসব ভূমিকা পালন না করে কেন্দ্রীয় সরকারের আর একটি অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের মাধ্যমের ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়।

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ যে সব কার্যাবলী পালন করে তা হল —

প্রথমত : জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের অন্যতম প্রধান কাজ হল জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের ক্রিয়াকলাপ সময়ে সময়ে সমীক্ষা করা।

দ্বিতীয়ত : জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাজ হল জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত আর্থ-সামাজিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রশ্ন বিবেচনা করা।

তৃতীয়ত : জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের শেষ কাজ হল জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির সুপারিশ করা, জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে ব্যবস্থাদি নির্ণয় করা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও উন্নয়নের ব্যাপারে পরামর্শ দান করা, অপেক্ষাকৃত কম উন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাদির সুপারিশ করা এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।

মূল্যায়ন : জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের কার্যাবলী থেকে একথা বলা যায় যে এই পর্ষদ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকারসমূহ ও পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে এক সংযোগ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। এই পর্ষদ কেবলমাত্র নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যেই সমন্বয় সাধন করে নি, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দৃষ্টি আরোপ করেছে। এই পর্ষদকে রাজ্যসমূহ ও কেন্দ্রের মধ্যে আলোচনার এক উল্লেখযোগ্য ফোরামও বলা যেতে পারে। এখানে সকলে মুক্ত মনের মত বিনিময় করতে পারেন যা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হতে পারে। তাছাড়া এই পর্ষদ কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগির জন্য এক অভিনব কৌশলও বলা যেতে পারে।

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের বিরুদ্ধে অবশ্য কিছু সমালোচক কিছু অভিযোগও এনেছেন। তাঁরা জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদকেও অন্যায়ভাবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দখলকারী 'সুপার-ক্যাবিনেট' বলে আখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক ব্রেচারের (Brecher) মতে — "The National Development Council was established as a super admin-

istrative and advisory body on planning .... it lays down policy directives invariably approved by the Cabinet. Since their inception, the N.D.C. and its standing committee have virtually relegated the Planning Commission to the status of research area." অর্থাৎ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ পরিকল্পনার চরম প্রশাসনিক এবং পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়েছে। এর গৃহীত নীতিগুলি সর্বদাই ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুমোদিত। এই পর্ষদ ও এর স্থায়ী কমিটি পরিকল্পনা কমিশনকে কার্যত একটি গবেষণা সংস্থায় পরিণত করেছে। অনুরূপ মন্তব্য করে গিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস অফিসার এইচ. এম. প্যাটেলও (H. M. Patel)। তাঁর মতে, 'জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ এমন এক উপদেষ্টা সংস্থা যা পরিকল্পনা কমিশন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বস্তুত এটি একটি নীতি নির্দ্ধারণকারী সংস্থা এবং এর সুপারিশ কখনই অগ্রাহ্য হয় না'।

অনুশীলনী :

১) জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

২) জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের ওপর একটি টীকা লেখ। (এতে পর্ষদের গঠন, কার্যাবলী ও মূল্যায়ন সংক্ষেপে আলোচনা কর।)

৩) জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

ক) কোন সালে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের জন্ম হয়েছিল?

খ) জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য কারা?

গ) জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ সাধারণত বছরে কবার সভায় মিলিত হয়ে থাকে?

ঘ) কোন ধরনের বিষয় জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে আলোচনা হয়ে থাকে?

ঙ) জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ কি একটি সংবিধান অন্তর্গত না সংবিধান বহির্ভূত সংস্থা?

চ) জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদকে 'সুপার-ক্যাবিনেট' কেন বলা হয়ে থাকে?

গ্রন্থপঞ্জী

১) Prasad, Kamta (ed) 1984, 'Planning and its Implementation', IIPA New Delhi.

২) Basu, D. D. 1995, 'Introduction to the Constitution of India.'

৩) Bakshi, P. M. 2000, 'The Constitution of India'.

৪) সোম, ড. সুভাষ চন্দ্র, ১৯৯৯, 'জন প্রশাসন'।

৫) চক্রবর্তী, অধ্যাপক দেবাশিস, ১৯৮৩, 'গণ-প্রশাসন, পরিচালনা ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা'।

একক ৩ □ ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor General of India)

ভারতবর্ষে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রশাসন বিভাগকে সংসদের নিকট দায়িত্বশীল রাখা। ফলে সংসদ সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়েছে। এই সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ আরও ব্যাপকভাবে আমরা দেখতে পাই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে। সংসদের এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তিনটি বিভাগ —

১) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক

২) আনুমানিক আয়-ব্যয় কমিটি

৩) সরকারী গণিতক কমিটি।

ভারত সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় হল নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কার্যালয়। এই কার্যালয় সারা দেশের আর্থিক কার্যকলাপের ওপর সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি রাখে। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে সেই কথাই বলা হ। ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে এক কথায় সরকারী ভাণ্ডারের অভিভাবক বলা যায়। সংসদের তি ছাড়া সরকারের সঞ্চিত তহবিল থেকে যাতে একটি পয়সাও খরচ না হয় সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখেন। ছাড়া কোন সময় সরকারী ব্যয়ের অপচয় হলে তিনি লোকসভার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে থাকেন।

ভারতীয় সংবিধান নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের পদ নতুনভাবে রচনা করলেও ভারতবর্ষে এই পদের বা কার্যালয়ের পরিচিতি কিন্তু খুব একটা নতুন ব্যাপার নয়। বৃটিশ শাসন কালে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এই পদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ শাসনব্যবস্থাতেই এই পদের সৃষ্টি হয় এবং তার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের সংবিধান রচয়িতারা ভারতীয় সংবিধানের ১৪৮, ১৪৯, ১৫০ ও ১৫১ ধারা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা এই পদটির গুরুত্ব ও গভীরতা উপলব্ধি করে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালনের অধিকারী করে গেছেন। নির্ভয়ে যাতে সরকারী ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আইন সভার নিকট রিপোর্ট দাখিল করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে সরকারী বা শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করে গেছেন। সেই দিক দিয়ে এই পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

আমাদের সংবিধানে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের পদটির স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাদি ও শর্তাদি অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, ভারতের নিয়ন্ত্রয়ক ও মহাগণনা পরীক্ষক ভারতের রাষ্ট্রপতির এক আদেশ-পত্র দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের পদচ্যুতির মত অনুরূপ পদ্ধতিতে পদচ্যুত হবেন। অর্থাৎ সংসদের উভয়কক্ষের অধিকাংশে সদস্যের দ্বারা সমর্থিত ও উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী দুই তৃতীয়াংশে সদস্য দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে সমর্থিত, প্রমাণিত অসামর্থ্য ও অসদাচারের জন্য অপসারণার্থ একটি আবেদন যদি রাষ্ট্রপতির কাছে আনীত হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের বেতন ও চাকরির শর্তাদি সংসদের আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে এবং নিয়োগের পরে এই সকল শর্তাদি তাঁর স্বার্থের প্রতিকূলে পরিবর্তন করা যাবে না। এই বিধান অনুযায়ী সংসদ ১৯৫৩ সালে 'নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের চাকরির শর্ত আইন' (The Comptroller and Auditor General's Conditions of Service Act, 1953) প্রণয়ন করে চাকরির শর্তাদি স্থির করে দেয়। পরবর্তীকালে, ১৯৭১ সালে পুনরায় ১৯৫৩ সালের ওই আইন পরিবর্তন করে ১৯৭৩ সালে আবার তার সংশোধন করে সংসদ ঘোষণা করে যে —

ক) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক নিয়োগের দিন থেকে ছয় বছর তাঁর পদে বহাল থাকবেন।

খ) তিনি ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকতে পারবেন ও তারপর তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর কার্যকলালের মেয়াদ কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না। অর্থাৎ তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই যদি তিনি ৬৫ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তবে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হবে কার্যকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই।

গ) তিনি যে কোন সময়ে তাঁর পদে ইস্তফা দিতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁকে স্বহস্তে লিখিত পদত্যাগ পত্র রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে পাঠিয়ে দিতে হবে।

ঘ) ইমপিচমেন্ট পদ্ধতিতে তাঁকে অপসারণ করা যাবে। (অনুচ্ছেদ ১৪৮(১), ১২৮ (৪))

ঙ) তাঁর বেতন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের সমান হবে।

চ) অবসর গ্রহণের পর তিনি বাৎসরিক অবসরকালীন ভাতা পাবেন, যা সময় সময় সংসদ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হবে।

ছ) অন্যান্য বিষয়ে তাঁর চাকরির শর্তাদি ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকের (I.A.S.) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নিয়মাবলী দ্বারা স্থিরীকৃত হবে, যার দ্বারা ভারত সরকারের সেক্রেটারী পর্যায়ের ব্যক্তির শর্তাদি নিয়ন্ত্রিত হয়।

তৃতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক অবসর গ্রহণের পর কোন সরকারী পদ বা সরকার অনুমোদিত কোন পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। সুতরাং ভারত সরকারের প্রশাসন বা কোন রাজ্যের প্রশাসনকে তোষামোদ করার কোন প্রবৃত্তি তাঁর হয় না। কিন্তু সংবিধানের ১৪৮(৪) অনুচ্ছেদের এই বিধানকে অবজ্ঞা বা ভঙ্গ করা হয়েছে শাসনতন্ত্রের ২৮০ ধারা অনুযায়ী সৃষ্ট ফিনান্স কমিশনের সভাপতি পদে অবসরপ্রাপ্ত কোন নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে নিয়োগ করে। বিচার বিভাগের মতেও এই নিয়োগ সমালোচনা যোগ্য ও অসমীচীন।

চতুর্থত, তাঁর নিজস্ব বেতন ও ভাতাদি এবং তাঁর কার্যকালের কর্মচারীদের ও প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য হবে এবং তা সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষ ব্যয় নয়।

এই আলোচনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের পদমর্যাদা ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির সমান। গণ পরিষদে ডঃ আম্বেদকর এই প্রসঙ্গে সংকেত দিয়েছিলেন যে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের স্বাধীনতা একটি বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতার তুলনায় কম।

সুপ্রীমকোর্টের কর্মচারীদের নিয়োগক্ষমতা সংবিধানের ১৪৬(১) ধারায় সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের এই ধরনের কোন ক্ষমতা নেই। স্বভাবতই অধীনস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কোনরকম ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা নেই। এই ক্ষমতা যদিও ভারত সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হবার ব্যবস্থা হয়, তবুও এই ধরনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যালয়ের প্রশাসনিক দক্ষতার দিক দিয়ে এটি স্পষ্টত হীনতাজনক।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সংবিধানের ১৪৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্র, রাজ্য ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের হিসেবপত্র সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক কি কি কর্তব্য পালন ও ক্ষমতা ভোগ করবেন তা সংসদ আইন করে স্থির করে দেবে। যতদিন না সংসদ প্রণীত আইন এক্ষেত্রে প্রবর্তিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের যে কার্য, ক্ষমতা ও কর্তব্য ছিল তা তিনি পালন করবেন। সংসদ ১৯৫৩ সালে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের ক্ষমতা, কর্তব্য ও চাকরির শর্ত সম্পর্কিত একটি আইন প্রণয়ন করে। পরে ১৯৭১ সালে পুণরায় পরিবর্তিত অনুরূপ একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে হিসেব পরীক্ষার মধ্যে বিভাজনের প্রস্তাব আসতে থাকায় এবং এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক পণ্ডিত বিরূপ মনোভাব পোষণ করায় ১৯৭৬ সালে ওই আইনের পুনরায় সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন দ্বারা হিসেব পরীক্ষা থেকে হিসেব রক্ষা ও সংগ্রহকে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় স্তরেই বাদ দেওয়া হয়। ফলে, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক উভয় ক্ষেত্রের হিসেব প্রস্তুত করার প্রাক্-সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেন। মূল সংবিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক রাষ্ট্রপতির আবেদনক্রমে হিসেবরক্ষক রূপে রাজ্যের ও ইউনিয়নের হিসেব রক্ষার নীতি নির্ধারণ করতেন ও হিসেবপত্র রক্ষা করতেন। পরে সরকারের বাৎসরিক হিসেব তৈরী করে তা সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট উপস্থিত করতেন। বর্তমানে তাঁকে আর এ কাজ করতে হয় না।

১৯৭৬ সালের সংশোধনী আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কার্যাবলী হল —

১) কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের এবং বিভিন্ন আইনসভা বিশিষ্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঞ্চিত তহবিল থেকে ধার্য ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করা এবং সেই ব্যয় আইন অনুযায়ী ব্যয়িত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করা। তিনি তাঁর হিসেব পরীক্ষার পর কোনরকম অনিয়ম, অন্যায় ও অপচয়মূলক ব্যয়ের সন্ধান পেলে তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে সে সব কথা উল্লেখ করতে পারেন ও তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। পূর্বে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব সম্পর্কিত রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে এবং রাজ্য সরকারের হিসেব সম্পর্কিত রিপোর্ট রাজ্যপালের কাছে উপস্থিত করার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালের সংশোধনের পর তাঁর হাত থেকে হিসেব সম্পর্কিত ওই ক্ষমতা হস্তান্তর করার ফলে তিনি ঐ ক্ষমতার আর অধিকারী নন।

২) অনুরূপভাবে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ ও কনটিনজেন্সি ফাণ্ড (Public Accounts and Contingency Fund) থেকে ব্যয়িত অর্থ সম্পর্কে হিসেব পরীক্ষা করা ও রিপোর্ট প্রদান করা।

৩) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে কোন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত সকল ব্যবসা বাণিজ্য, কারবার অর্থাৎ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসানের হিসেব পরীক্ষা ও তৎসম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদান করা।

৪) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকরের আয়-ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করা এবং কর স্থাপন, অর্থসংগ্রহ ও রাজস্ব-বন্টনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিয়ম ও পদ্ধতি রক্ষিত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করা ও লক্ষ্য রাখা।

৫) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের রাজস্ব দ্বারা স্থায়ী ও সম্পূর্ণভাবে আর্থিক সাহায্যপুষ্ট যে কোন সংস্থা, সরকারী কোম্পানী ও করপোরেশনের আয়-ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করা ও রিপোর্ট প্রদান করা।

পদমর্যাদা

নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কার্যাবলীর বিবরণ থেকে আমরা তাঁর পদমর্যাদা অতি সহজেই নির্ণয় করতে পারি। সরকারী অর্থের ওপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ আজ এত শক্তিশালী হওয়ার মূলে রয়েছে দুটি মাধ্যম। নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। ভারতীয় সংবিধানে এর কার্যাবলী ও ক্ষমতাশীলতা বিচার বিবেচনা করে অনেকে একে 'সরকারী অর্থের জাগ্রত প্রহরী' (Watchdog of Public Purse) বলে বর্ণনা করেছেন। নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক একদিক সরকারী অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় ও অন্যায় অপব্যয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, অন্যদিকে আবার ওই বিষয়ে সদিচ্ছা, সততা ও সুবিন্যস্ত আর্থিক রীতিনীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সে বিষয়ে যথাযথ রিপোর্ট প্রদান করেন। এককথায় তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় অনিয়মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে অশোক চন্দের মন্তব্যটি খুবই মূল্যবান — "His role is to maintain the dignity, independence, detachment of out-look and fearlessness necessary for a fair, impartial and dispassionate assessment of the actions of the executive in the financial field." এই কারণেই সংবিধানে তাঁর চাকরির শর্তাবলী অত কঠিন করা হয়েছে, বিশেষত তাঁর অপসারণের ব্যাপারে।

ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক এবং বৃটেনের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও আমাদের সংবিধানে তাঁকে একাধারে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কার্যত তিনি কিন্তু কেবলমাত্র মহাগণনা পরীক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। নিয়ন্ত্রক হিসেবে তাঁর খুব একটা ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। আর যদিও বা থাকে, তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বৃটেনে মহাগণনা পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ হল ব্যাঙ্ক অভ ইংলণ্ডের সরকারী তহবিলে সরকারী আয় জমা পড়ছে কিনা এবং ওই তহবিল থেকে আইন সম্মত উপায়ে সকল অর্থ তোলা হচ্ছে কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করা। তাঁর সম্মতি বা সমর্থিত সই ছাড়া কোন অর্থ সরকারী তহবিল থেকে ওঠানো যায় না। সুতরাং সরকারী আয়-ব্যয়ের তিনি কেবলমাত্র হিসেব পরীক্ষক হিসেবেই কাজ করেন না, তার নিয়ন্ত্রক হিসেবেও পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করেন। তাই পক্ষান্তরে ভারতে আমরা মহাগণনা পরীক্ষককে বৃটেনের মত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দেখতে পাই না। তিনি নামমাত্র নিয়ন্ত্রক। তাঁর সম্মতি ব্যতিত প্রতিরক্ষা ও রেলপথ প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই সঞ্চিত তহবিল থেকে যথেচ্ছ ভাবে অর্থ ওঠানো হয়। ঐ সমস্ত অর্থের ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা ও তৎসম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদান করাই আমাদের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের একমাত্র কাজ, সরকারী অর্থের আয়-ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ নয়।

এই ব্যবস্থা ভারত শাসন আইনের ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। সেখানে আমরা কেবলমাত্র মহাগণনা পরীক্ষকের অস্তিত্ব বা ভূমিকা দেখতে পাই, নিয়ন্ত্রক হিসেবে কোন রকম ভূমিকা পাই না। সংবিধান প্রবর্তনের পর চিন্তা করা হয়েছিল যে আমাদের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে বৃটেনের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের মত উভয়ক্ষেত্রেই শক্তিশালী করা হবে। কিন্তু অদ্যাবধি বৃটেনের ধাঁচে সরকারী তহবিলের ওপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল না। কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রক হিসেবে সম্ভাষিত হয়েই রইল।

উপসংহারে, আমরা বলতে পারি যে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের নিয়োগ প্রতিটি জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। সরকারকে বা শাসন বিভাগকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে অর্থব্যয় করতে হলে ও সংসদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই কার্যালয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সরকারের বিবেচনাপূর্বক একজন উপযুক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এই পদে আসীন করা উচিত। যে কোন নিয়ন্ত্রণ ও চাপ বা প্রভাব থেকে এই উচ্চপদমর্যাদাশীল কার্যালয়কে মুক্ত রাখা উচিত। গণতন্ত্রের শুভানুধ্যায়ীরা সকলেই এই বিভাগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

কিন্তু বর্তমানে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কার্যাবলীর মধ্যে দুটি বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হল, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের হিসেব পরীক্ষক হিসেবে সংসদের পক্ষ থেকে আইনসম্মত উপায়ে সরকারী ব্যয় শাসন বিভাগ কর্তৃক হচ্ছে কিনা তার হিসেব পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয়ে অর্থাৎ অমিতব্যয়িতা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার বা কোন আর্থিক সুব্যবস্থার পরামর্শদান করার ক্ষমতা আছে কিনা। গোঁড়া (Ortho-dox) মহলের মতে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের উক্ত ক্ষমতা থাকা উচিত। কিন্তু সরকারী প্রশাসনিক বিভাগগুলি এর পরিপন্থী। তাদের মতে এই ধরণের হস্তক্ষেপ তাদের প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাদের এই অভিমত আরও জোরালো হয় বিখ্যাত মার্কিন প্রশাসন বিশেষজ্ঞ পল অ্যাপেলবির সমর্থন পাওয়ায়। তাঁর মতে এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ও অবিভাজ্যরূপে প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের এই তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের এই প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা না থাকার দরুণ আর্থিক সুবন্দোবস্ত সম্পর্কে মাথা না ঘামানোই উচিত।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের হিসেব পরীক্ষার ক্ষমতাটি বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় কার্যে বিস্তৃত করা যায় কিনা। প্রাক্তন নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক নরহরি রাও সরকারী গণিতক কমিটির সামনে তীব্র ভাষায় বলেছিলেন, 'যেহেতু সরকারের সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে অর্থ ঐসব প্রতিষ্ঠানে ও সংস্থায় ব্যয়িত হয়, সেইহেতু সরকারের পক্ষে ঐসব প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করা নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের দায়িত্ব ও অধিকার হওয়া উচিত।' কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের এই ক্ষমতা বর্ধনের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সরকারের মতে, যেহেতু নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, সেইহেতু তাদের হিসেব পরীক্ষা করা যথাযথভাবে সম্ভব নয়।

কিন্তু এই বিতর্কিত প্রশ্নের আংশিক অবসান ঘটে গেছে ১৯৭১ সালে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন দ্বারা। সেই আইনে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে — "The Comptroller and Auditor General is empowered to audit and report on the receipts and expenditure of Govern-

ment Companies and other bodies which are substantially financed from the Union or State revenues, irrespective of any specific legislation in this behalf" অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে যে সব সরকারী কোম্পানী বা অন্যান্য সংস্থা অর্থের যোগান পেয়ে থাকে, সেগুলির হিসাব পরীক্ষার অধিকার সি. এ. জি কে দেওয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

১) ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

২) ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের ওপর একটি টীকা লেখ। (পদটি কেন সৃষ্টি করা হয়েছিল, সংবিধানের কত নম্বর ধারায় এর স্থাপন হয়েছে, কার্যাবলী কী কী এবং এর থেকে তাঁর পদমর্যাদা সম্পর্কে আমাদের কী ধারণা হয়?)

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

ক) 'সরকারী অর্থের জাগ্রত প্রহরী' কাকে বলা হয়?

খ) সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের কথা বলা আছে ?

গ) 'নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক' - এই পদটি কেন সৃষ্ট হয়েছিল?

ঘ) বৃটিশ শাসনকালের কোন আইনে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের পদের সন্ধান পাওয়া যায়?

ঙ) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের চাকরীর মেয়াদকাল কয় বছরের ?

চ) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে হলে কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়? সংবিধানের কোন ধারায় তা বলা আছে ?

গ্রন্থপঞ্জী

১) Basu, D. D. 1995, 'Introduction to the Constitution of India'.

২) Bakshi, P. M. 2000, 'The Constitution of India'.

৩) সোম, ডঃ সুভাষচন্দ্র, ১৯৯৯, 'জন প্রশাসন'।

৪) Arora, Ramesh K & Goyal, Rajni. 1995, 'Indian Public Administration, Institutions and Issues'.

একক ৪ □ অর্থ কমিশন (The Finance Commission)

ভারতবর্ষে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে যে সব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল অর্থকমিশন (Finance Commission)।

সংবিধানের ২৮০ নং ধারা অনুসারে সংবিধান প্রবির্তিত হওয়ার দুবছরের মধ্যে এবং তারপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর, অথবা প্রয়োজনে পাঁচ বছরের আগেই রাষ্ট্রপতি একটি করে অর্থকমিশন নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি এবং চারজন সাধারণ সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। অর্থ কমিশন একটি অস্থায়ী সংস্থা, রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন পেশ করলেই এর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায়।

সংবিধানের ২৮০(৩) নং ধারা অনুসারে অর্থ কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন পেশ করে থাকে ঃ

(১) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টনযোগ্য বিভিন্ন কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্র কতখানি পাবে এবং রাজ্যগুলি কতখানি পাবে, সে বিষয়ে সুপারিশ করা।

(২) ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অনুদান (Grants-in-aid) হিসাবে কোন রাজ্যকে কতখানি অর্থ প্রদান করা হবে, সে বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করা, এবং

(৩) ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের নিকট যেসব বিষয় প্রেরণ করবেন, অর্থকমিশন সেইসব বিষয়ে সুপারিশ করবে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংবিধানের ৭৩তম এবং ৭৪তম পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থ কমিশনের কাজের পরিধি বাড়িয়ে স্থানীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের তহবিল বাড়িয়ে কিভাবে স্থানীয় সরকারকে আর্থিক অনুদান দেওয়া যায় - এ বিষয়টি এখন অর্থ কমিশনের বিচার্য্য।

অর্থকমিশন গঠনের ক্ষেত্রে বা এর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির কোন ভূমিকা না থাকায় অনেকে এই কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পরন্তু, অর্থ কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করা না করা সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্টের ইচ্ছাধীন। তবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা না থাকলেও রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত কমিশনের প্রতিবেদন অগ্রাহ্য করে না। এম. ভি. পাইলীর (M. V. Pylee) মতে, "It will be almost impossible for the union to go against the recommendations of the Commission."

আর্থিক ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারের যতটা স্বাধীনতা থাকা উচিত, আমাদের দেশে যে সেটা নেই তা ঠিকই। তবে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছু পরিমাণ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থাকা উচিত। আবার এটাও ঠিক যে ভারতে রাজ্যগুলির হাতে সম্পদ সংগ্রহ করার ক্ষমতা আরও বাড়ানো উচিত। দেশের আর্থিক জীবনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে এসেছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল নীতি থেকে দেশ অনেকটা সরে এসেছে। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের পরিধি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। রাজ্যগুলির স্বার্থে এই পরিধি আর বাড়ানো উচিত নয়। বিক্রয় করের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের আর রাজ্য সরকারের অধিকারে

হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বাণিজ্য শুল্ক (Customs Duty) থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের একটি অংশ রাজ্য সরকারকে দেওয়া উচিত। রপ্তানি আয়েরও একটি অংশ রাজ্য সরকারকে দেওয়া উচিত। এটা মনে রাখা দরকার যে রাজ্যগুলির আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে দেশ অর্থনৈতিক বিকাশের পথে এগোতে পারবে না। আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণে রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া অযৌক্তিক নয়। দেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ, খাদ্যশস্যের সংগ্রহ-মূল্যের বৃদ্ধি, পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন জিনিসের (যেমন পেট্রোল, ডিজেল, ভোজ্য তেল) দাম বৃদ্ধি, অনুৎপাদনমূলক ব্যয় বৃদ্ধি বহুলাংশে দায়ী। এগুলি সবই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অথচ, মুদ্রাস্ফীতির দায়-দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির উপরও এসে পড়ে। সারা দেশে আর্থিক শৃঙ্খলা থাকলে এই অবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভব। কিন্তু আর্থিক শৃঙ্খলার নামে সব আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকলে রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে উন্নয়নমূলক কাজের সম্ভাব্য অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশে যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সুসংহত আর্থিক সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে তবে ভারতের ক্ষেত্রেও সেটা সম্ভব হওয়া উচিত।

(নবম অর্থ কমিশনের সুপারিশ) : নবম অর্থকমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল —

(১) কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্বের ন্যায়সঙ্গত বন্টন কিভাবে করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করা এবং কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে এমনভাবে আর্থিক সম্পদ স্থানান্তর করা যাতে রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাধিকার (Fiscal Autonomy) বজায় থাকে ও কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ের ক্ষেত্রেই আর্থিক দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।

(২) কেন্দ্রীয় রাজস্বের কতটা অংশ অথবা সাহায্য অনুদানের (Grants-in-Aid) কতটা অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হবে তা নির্ধারণ করা যাতে রাজ্যগুলি তাদের বাজেটভিত্তিক রাজস্বের প্রয়োজন মেটাতে পারে; এবং

(৩) সেই রাজস্ব রাজ্যগুলির মধ্যে কিভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টিত হতে পারে তা নির্ধারণ করা।

নবম অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনে কোন রাজ্যের পক্ষে কতটা রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব এবং কেন্দ্র ও রাজ্য পরস্পরের ক্ষেত্রে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কতটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সে সম্পর্কে একটি নীতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী (Normative approach) অনুসরণ করা হয়েছিল। কর ধার্য করার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে এবং সেটা সব রাজ্যের ক্ষেত্রে সমান নাও থাকতে পারে। তাছাড়া করের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর প্রয়াস সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উন্নয়নের স্তরের উপরও নির্ভরশীল।

নবম অর্থকমিশনের প্রাথমিক প্রতিবেদনে প্রথম বছরের জন্য ১৩,৬২২ কোটি টাকা পরিকল্পনা বর্হির্ভূত রাজস্ব খাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলিকে হস্তান্তরিত করার সুপারিশ ছিল। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে নবম অর্থ কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করেছে —

১) আয়কর রাজস্বের বন্টন (Sharing of the revenue from income tax) - নবম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের ৮৫ শতাংশ রাজ্যগুলির প্রাপ্য ছিল। তবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে

এই রাজস্ব বন্টিত হয়েছিল নিম্নলিখিত সূত্র অনুযায়ী — (ক) ১০ শতাংশ বন্টিত হবে প্রত্যেকটি রাজ্যের কর আদায়ের ভিত্তিতে, (খ) ৪৫ শতাংশ বন্টিত হবে কোন রাজ্যের মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় উৎপাদনকারী রাজ্যের (অর্থাৎ পাঞ্জাব) চেয়ে কতটা কম এবং তাকে ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়ায় তার ভিত্তিতে।

(গ) ১৯৭১ সালে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টিত হবে ২২.৫ শতাংশ (ঘ) ১১.২৫ শতাংশ বন্টিত হবে মাথাপিছু আয়ের বিপরীতকে ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা দিয়ে গুণ করে (inverse of the per capita income multiplied by the 1971 population)

২) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের বন্টন (Sharing of the revenues from Central excise duties) নবম অর্থ কমিশন অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য নির্দিষ্ট করেছিল ৪৫ শতাংশ। এই ৪৫ শতাংশ রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সূত্র অনুসরণ করার সুপারিশ কমিশন করেছিল। (ক) ২.৫ শতাংশ বন্টিত হবে ১৯৭১ সালে বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে। (খ) ১২.৫ শতাংশ বন্টিত হবে রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আয়ের ভিত্তিতে (on the basis of income adjusted total population)। এই আয় হিসাব করা হবে ১৯৮২-৮৫, এই তিন বছরের গড় মাথাপিছু আয়ের বিপরীতের সঙ্গে রাজ্যের ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার গুরুত্বের ভিত্তিতে (weighting the 1971 population of the state with the inverse of the average per capita income for the period 1982-85)

গ) ১২.৫ শতাংশ বন্টিত হবে রাজ্যগুলির আপেক্ষিক অনগ্রসরতার সূচীর ভিত্তিতে। (ঘ) ৩৩.৫ শতাংশ বন্টিত হবে কোন রাজ্যের মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় উপার্জনকারী রাজ্যের (অর্থাৎ পাঞ্জাব) চেয়ে যতটা কম এবং তাকে ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যা দাঁড়ায় তার ভিত্তিতে। (ঙ) অবশিষ্ট ১৬.৫ শতাংশ বন্টিত হবে কর বন্টনের পরেও যে সব রাজ্যে ঘাটতি থেকে যাবে তাদের মধ্যে।

(৩) বিক্রয় করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের বন্টন (Sharing of additional excise duties in lieu of Sales tax) - কমিশনের সুপারিশ ছিল চিনি, বস্ত্র এবং তামাকের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে রাজস্বের সম্পূর্ণ অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হবে এবং এক্ষেত্রে অন্যান্য অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে যে নীতির ভিত্তিতে রাজস্ব বন্টনের নীতি অনুসরণ করা হবে, সেটাই প্রযোজ্য হবে। এই তিনটি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক বিক্রয় করের পরিবর্তে ধার্য করা হয়ে থাকে।

(৪) যাত্রী ভাড়ার ক্ষেত্রে করের পরিবর্তে অনুদান (Grant in lieu of tax on passenger fares) - নবম অর্থকমিশনের কাছে রাজ্যগুলির দাবী ছিল স্থানীয় রেলগাড়ী ছাড়া অন্য রেল পথের যাত্রী ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের ১০.৭ শতাংশ বাৎসরিক ক্ষতিপূরণমূলক অনুদান হিসাবে পাওয়া। কিন্তু কমিশন এই দাবী অগ্রাহ্য করে এক্ষেত্রে রাজ্যগুলির জন্য এককালীন অনুদান হিসাবে ১৫০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছিল। প্রতিটি রাজ্যে সৃষ্ট রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে যে আয় হয় সেই অনুপাতে এই টাকা বন্টনের সুপারিশ করা হয়েছে। মিজোরাম ছাড়া (সে রাজ্যে রেলপথ নেই) সব রাজ্যই এই অর্থের অংশ পেয়ে থাকে।

৫) অনুদান (Grant-in-aid) - বিভিন্ন রাজ্যের রাজস্বের পরিপূরক হিসাবে কতটা অনুদান প্রয়োজন সে সম্পর্কে নবম অর্থকমিশন যা যা বিবেচনা করেছে সেগুলি হল — (ক) পঁচিশটি রাজ্যের পরিকল্পনা-বহির্ভূত রাজস্বের অবস্থা (কর এবং শুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বন্টন বা ধার) বিবেচনা করে কমিশন দেখেছে যে গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র — এই চারটি রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজস্ব বন্টনের আগেই উদ্বৃত্ত দেখা যায়। (খ) কর এবং শুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বন্টনের পর পরিকল্পনা-বহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে অসম, উড়িষ্যা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ বাদে অন্যান্য সব বড় বড় রাজ্য হল উদ্বৃত্ত রাজ্য।

গ) রাজস্ব বন্টনের পরেও অসম, উড়িষ্যা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং গোয়া ও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলি হল ঘাটতি রাজ্য। কমিশন ১৯৯০-৯৫ সালের জন্য এই রাজ্যগুলির মোট ঘাটতির পরিমাণ ৬,০১৬ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করেছিল।

নবম অর্থ কমিশন ত্রাণ বাবদ ব্যয়ের (Relief Expenditure) জন্য প্রতি বছর ৮০৪ কোটি টাকার একটি তহবিল স্থাপনের সুপারিশ করেছিল। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হবে ৬০৩ কোটি টাকা।

(দশম অর্থকমিশনের প্রতিবেদন) — কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টন সম্পর্কিত দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি ১৯৯৫-২০০০ সালের জন্য প্রয়োগ করা হবে। এই সময়কালের মধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার দুটি বছর (১৯৯৫-১৯৯৭) অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যগুলির যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা কিভাবে মেটানো যেতে পারে সে বিষয়েও সুপারিশ প্রদান করার জন্য দশম অর্থ কমিশনকে বলা হয়েছিল।

দশম অর্থ কমিশনের প্রধান সুপারিশ হল, কেন্দ্রীয় রাজস্বের মোট ২৯ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করতে হবে। এই সুপারিশ কার্যকর করার জন্য ২০০০ সালের মে মাসে লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল অনুমোদিত হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে এই সুপারিশ কার্যকর হবে। দশম অর্থ কমিশনের অন্যান্য সুপারিশগুলি অষ্টম ও নবম অর্থ কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যেতে পারে।

অষ্টম অর্থ কমিশন বন্টনযোগ্য আয়করের অংশে রাজ্যগুলির জন্য রাজস্বের ৮৫ শতাংশ বরাদ্দ করেছিল এবং বন্টনযোগ্য অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে রাজস্বের ৪৫ শতাংশ বরাদ্দ করেছিল। অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে বন্টনযোগ্য ৪৫ শতাংশের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ঘাটতি রাজ্যগুলির জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। নবম অর্থ কমিশন উপরোক্ত বন্টনব্যবস্থা বজায় রেখে অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে বন্টনযোগ্য ৪৫ শতাংশের মধ্যে ৭.৪২৫ শতাংশ আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিল। দশম অর্থ কমিশন বন্টনযোগ্য রাজস্ব রাজ্যগুলির অংশ হিসাবে ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে ৭৭.৫ শতাংশ এবং উৎপাদন শুল্ক বা অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে ৪৭.৫ শতাংশ বরাদ্দ করেছে। কমিশনের বক্তব্য হল, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ব্যক্তিগত আয়কর আদায় করে থাকে সেজন্য আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ আরও বেশি হওয়া উচিত,তাতে রাজ্য সরকারগুলির যে ক্ষতি হবে সেই ক্ষতিপূরণ হবে অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে প্রাপ্য রাজস্বের অংশ ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধির দ্বারা। দশম অর্থ কমিশনের এই সুপারিশ রাজ্যগুলিকে আরো নিরাশ করেছে। রাজ্যগুলি এমনিতেই অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্য রাজস্বের অংশ বাড়বে এই আশা করেছিল, ব্যক্তিগত আয়কর থেকে প্রাপ্য রাজস্বের অংশ হ্রাসের বিনিময়ে এই প্রাপ্তি রাজ্যগুলি আশা করেনি।

ব্যক্তিগত আয়কর এবং অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কমিশন কর্তৃক যে নিয়ম অনুসৃত হয়েছিল দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশেও সেই নিয়মই বজায় আছে। নিয়মটি হল, বন্টনযোগ্য রাজস্বের ২০ শতাংশ বন্টিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে; ৬০ শতাংশ বন্টিত হবে রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয়ের উপর ভিত্তিশীল সমঞ্জস দূরত্বের ভিত্তিতে (Adjusted distance criterion); ১০ শতাংশ বন্টিত হবে কর আদায়ের প্রচেষ্টার ভিত্তিতে; ৫ শতাংশ বন্টিত হবে রাজ্যকে সাহায্য করার জন্য তৈরি পরিকাঠামোর ভিত্তিতে, বিশেষ করে যে সব রাজ্যে জনসমষ্টি অনেকটা ছড়িয়ে আছে এবং পরিকাঠামো খুবই নিম্নমানের সেই রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচিত হবে।

দশম অর্থ কমিশন স্থানীয় সংস্থাগুলির (Local Bodies) জন্য ৫৩৮০.৯৩ কোটি টাকা (মোট অর্থ স্থানান্তরের ২.৪ শতাংশ) বরাদ্দ করেছে। তাছাড়া সংকট ত্রাণ তহবিল (Calamity Relief Fund) বাবদ ১৯৯৫-২০০০ সালের জন্য কমিশন ৬,৩০৪.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। দশম অর্থ কমিশনের মতে অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে রাজস্ব বন্টনের ভিত্তি হওয়া উচিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (State Domestic Products) ভিত্তিতে ৪০ শতাংশ এবং রাজ্যের বিক্রয় কর আদায়ের ভিত্তিতে ১০ শতাংশ।

রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার ভাড়ার উপর ধার্য কর বাতিল হয়ে যাওয়ায় রাজ্যগুলি যাতে রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য দশম অর্থ কমিশন ১৯৯৫-২০০০ সালের জন্য ৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার থেকে রেলওয়ে আয়ের ১০.৭ শতাংশ এভাবে রাজ্যগুলি পাবে। নবম অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনে এক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল ১৫০ কোটি টাকা।

যে সব রাজ্যে আর্থিক সংকট খুবই তীব্র সেই রাজ্যগুলির জন্য কমিশন ঋণ ত্রাণের (Debt-relief) ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। এক্ষেত্রে উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব বিবেচিত হয়েছে। অষ্টম অর্থ কমিশন এই ধরনের ত্রাণ বাবদ ২২৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। নবম অর্থ কমিশন বরাদ্দ করেছিল ৯৭৩.৬২ কোটি টাকা। দশম অর্থ কমিশন এক্ষেত্রে বরাদ্দ করেছে ৭০১.১৪ কোটি টাকা।

দশম অর্থ কমিশন রাজস্ব বন্টনের বিকল্প পন্থা হিসাবে কর আদায়ের ক্ষেত্রে সব করেরই অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া যেতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে এবং এই যুক্তির সমর্থনে কর সংস্কার কমিটির (Tax Reforms Committee or Chelliah Committee) সুপারিশ উল্লেখ করেছে। কর সংস্কার কমিটির মতে দেশের মোট কর রাজস্বের ২৫ শতাংশ রাজ্যগুলির অংশ হওয়া উচিত। যদি এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তবে রাজ্যগুলি কর আদায়ে এবং কর ব্যবস্থার গতিশীলতা বাড়াতে আরও সচেষ্ট হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। দশম অর্থ কমিশনের মতে মোট রাজস্বের ২৯ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া উচিত।

(একাদশ অর্থ কমিশনের প্রথম প্রতিবেদন) — First Report of the Eleventh Finance Commission – একাদশ অর্থ কমিশনের প্রথম কিস্তি ২০০০ সালের আগস্ট মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়েছে। একাদশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি আগেকার অর্থ কমিশনগুলির প্রতিবেদনে ছিল না। এই প্রথম অর্থ কমিশন কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির কোষাগার ঘাটতি বা আর্থিক ঘাটতি (Fiscal Deficit) কমানো যায় সেই সম্পর্ক সুপারিশ প্রদান করেছেন। তাছাড়া আর্থিক সংস্কারের কর্মসূচী কেমন ভাবে ঠিকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।

একাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত মোট বন্টনযোগ্য কর রাজস্বের ২৯.৫ শতাংশ রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করতে হবে, এবং কর রাজস্ব ছাড়া অন্য খাতে প্রদেয় অর্থ (ত্রাণ তহবিল, বিভিন্ন অনুদান, প্রভৃতি) সহ মোট রাজস্বের ৩৭.৫ শতাংশ রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করতে হবে। একাদশ অর্থকমিশনের এই সুপারিশ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। একাদশ অর্থকমিশনের সভাপতি অধ্যাপক খুসরোর মতে দশম অর্থ কমিশন কর্তৃক রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা একাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশভিত্তিক রাজস্ব বন্টন ৯১ শতাংশ বেশি হবে। কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্যে ফাঁক রয়ে গেছে।

প্রথমত, আগামী পাঁচ বছরে মূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) যা বাড়বে বলে ধরা হয়েছে (১৩ শতাংশ), তার অনুপাত হিসাবে একাদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ দশম অর্থ কমিশনের চেয়ে বেশি হবে না। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯০-৯১ সাল থেকে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারগুলিতে অর্থ স্থানান্তর ছিল কর রাজস্বের ৩৮.৭২ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত, একাদশ অর্থ কমিশনের উর্দ্ধে ৩৭.৫ শতাংশের চেয়ে বেশি।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে কতটা অর্থ হস্তান্তরিত হবে সেটার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কতটা রাজস্ব আদায় করতে পারল, তার যোগসূত্র সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন সুপারিশ প্রদান না করায় রাজ্যগুলিও আগামী পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কতটা অর্থ পাবে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারছে না।

তৃতীয়ত, দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় বন্টনযোগ্য রাজস্বের যে ২৯ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেটা ছিল স্থূল রাজস্বের অনুপাত; কিন্তু একাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে ২৯.৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় রাজস্ব রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করা হবে সেটা হল নীট রাজস্ব (net revenue)। এর ফলে দশম অর্থকমিশনের বরাদ্দের তুলনায় একাদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দে রাজ্যগুলির ভাগে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হবে। একাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে ভাগ করে দেবে ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

সম্প্রতি আটটি রাজ্য সরকার একাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ সংশোধন করার দাবি নিয়ে এবং আরও বেশি কেন্দ্রীয় সাহায্যের দাবিতে একজোট হয়েছে। পাঞ্জাবের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় গত দশ বছরে এই আটটি রাজ্যের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি রাজ্য পাঞ্জাবের সঙ্গে পার্থক্য অনেকটা কমাতে পেরেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং মহারাষ্ট্রে মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Domestic Production) উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। শুধু তাই নয়, একাদশ অর্থকমিশন রাজ্যগুলির আর্থিক স্বয়ম্ভরতা (Fiscal self-reliance) অর্জনের যে সুপারিশ করেছে, তার নিরিখেও এই চারটি রাজ্য আর্থিক স্ব-নির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই স্ব-নির্ভরতা অন্তত চারটি রাজ্যে একশোভাগ অর্জিত হয়েছে এবং আরও তিনটি রাজ্যে একশোভাগের কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে (মহারাষ্ট্র ৯৯.৭৬ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ৯৫.৪৩ শতাংশ এবং হরিয়ানা ৯৬.৪ শতাংশ)। অথচ একাদশ অর্থ কমিশনের বাটোয়ারায় অন্ধ্রপ্রদেশের অংশ কমে হয়েছে ৭.১৩ শতাংশ (দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশে এটা ছিল ৭.৩৮ শতাংশ) এবং কেরালার অংশ ৩.৪ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২.৮৩ শতাংশ। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ৬.৬১ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮.১ শতাংশ, যদিও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ একেবারে অগ্রসর রাজ্য নয়। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে অন্ধ্রপ্রদেশ সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কেরালা সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে,

বিশেষ করে স্ত্রী সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া কেরালায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (Democratic decentralisation), বিশেষ করে স্থানীয় বোর্ড ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ যথেষ্ট এগিয়েছে। সুতরাংএকাদশ অর্থ কমিশনের বাটোয়ারায় এই দুটি রাজ্যের বরাদ্দ কমে যাওয়ায় তাদের বিদ্রোহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। একাদশ অর্থ কমিশন যেভাবে অনুদানের বাটোয়ারা করেছে তাতে যেসব রাজ্যে উন্নয়ন হার বাড়ছে যেগুলিকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল ততটা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

একাদশ অর্থ কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে আর্থিক ঘাটতি কমাবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার সুপারিশ করেছে এবং এজন্য সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ সীমিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কমিশনের মতে আগামী পনেরো বছর কোনও বেতন কমিশন গঠন করা উচিত হবে না। তাছাড়া বিশেষ প্রয়োজন বা বিশেষ অবস্থা ছাড়া নিয়মভিত্তিক বছরে দুবার সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা বাড়ানোও বন্ধ করা উচিত বলে কমিশন মনে করে। যে সব সরকারী দপ্তরে বা সরকারী উদ্যোগে উদ্বৃত্ত কর্মচারী আছে সেগুলিতে বাড়তি নিয়োগ বন্ধ করার কথাও কমিশন বলেছে। একাদশ অর্থ কমিশন রাজ্যগুলিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অনুদান দেওয়ার জন্য একটি জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরিচালনা কেন্দ্র (National Centre for Calamity Management) গঠন করার কথা বলেছে।

একাদশ অর্থকমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে যে আটটি রাজ্য সোচ্চার হয়েছে তাদের যুক্তি হল, অপেক্ষাকৃত কয়েকটি গরীব রাজ্য, যেমন বিহার, মধ্যপ্রদেশ, সিকিম, ওড়িশা, অসম, কাশ্মীর এবং উত্তরপ্রদেশ কমিশনের বাটোয়ারায় বেশি লাভবান হচ্ছে; তেমনি তামিলনাড়ু, কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশে দারিদ্রের হার কমে গেলেও সেই রাজ্যগুলি অধিক অর্থবরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে তামিলনাড়ুতে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত জনসমষ্টি ১৬.৬৩ শতাংশ কমে গিয়েছিল; কেরালায় এটা কমে দাঁড়িয়েছিল ১৪.৯৯ শতাংশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এটা কমে হয়েছিল ৬.৭২ শতাংশ। কমিশন অর্থ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে শুধু মাথাপিছু আয়ের উপর গুরুত্ব ৬০ শতাংশ থেকে ৬২.৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন, কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে আয়ের বৈষম্য ও দারিদ্র কমেছে কিনা সেই দিকটি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেননি। এর ফলে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায় নীতি অনুসৃত হয়েছে বলা চলে না। তাছাড়া কয়েকটি রাজ্যের দাবি হল, ২৯.৫ শতাংশের পরিবর্তে স্থূল কর রাজস্বের ৩৩ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া উচিত। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের পরিমাণও আরও বাড়ানো উচিত।

অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্যগুলি বেশি উপকৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অসম কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, সিকিম প্রভৃতি রাজ্য এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপকৃত। দশম অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রের দেয় অর্থের হার ৭.৫ শতাংশ নামিয়ে দিয়েছিলেন। একাদশ অর্থ কমিশন এই হার বাড়িয়ে ৮.১ শতাংশ করার সুপারিশ করেছেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য দাঁড়াবে ৩৫,২২০ কোটি টাকা। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গকে বাড়তি ১৬০০ কোটি টাকা দেওয়ার সুপারিশও একাদশ অর্থ কমিশন করেছেন।

একাদশ অর্থ কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক খুসরো বলেছেন, কোনও রাজ্যকেই তিনি বঞ্চিত করেননি, তবে তাঁর মতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজ্যগুলির প্রতি একটু বেশি নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের অভিমত হল, — যে সব রাজ্য কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে

এগিয়ে যাচ্ছে এবং দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নেও এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের প্রচেষ্টাকে আরও সক্রিয় করার জন্যই কমিশনের উচিত এই রাজ্যগুলির জন্য আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো।

অনুশীলনী

১) অর্থ কমিশনের অবস্থান ও কার্যাবলী নির্ণয় কর।

অথবা,

২) অর্থ কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর হিসেবে কমিশনের সাংবিধানিক অবস্থান আলোচনা করার পর এর কার্যক্ষমতা এবং সেই কার্যের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।)

৩) নবম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা কর।

৪) দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা কর।

(আলাদা আলাদা খাতে প্রত্যেকটি সুপারিশ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।)

৫) একাদশ অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

ক) ভারতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিষ্ঠানটির নাম কী?

খ) সংবিধানের কত নম্বর ধারায় অর্থকমিশন গঠনের কথা বলা আছে?

গ) অর্থ কমিশন কোন কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে পারে?

ঘ) অর্থ কমিশনের মেয়াদ কয় বছরের?

ঙ) কর সংস্কার কমিটি বা চেলাইয়া কমিটির সুপারিশগুলি আলোচনা কর।

গ্রন্থপঞ্জী

ক) Basu, D. D. 1995, 'Introduction to the Constitution of India.'

খ) Bakshi, P. M. 2000, 'The Constitution of India'.

গ) দালাল, প্রণব কুমার, ১৯৯৬, 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমগ্র'।

ঘ) গুপ্ত, সুব্রত, ২০০০, 'ভারতীয় অর্থনীতি'।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে ; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—*সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

Published by : Netaji Subhas Open University, 1 Woodburn Park, Kolkata-700 020
and Printed at : SEVA MUDRAN, 43, Kailash Bose Street, Kolkata-700 006